ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রহিমাহুল্লাহ

আল আকিদাতুল হাসানাহ

আলী হাসান উসামা

অনূদিত

ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি ﵀

আল-আকিদাতুল হাসানাহ

প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৯
প্রকাশক : প্রত্যয়
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৭৪৩ ৭৮৪৫৫০, ০১৭৪৬ ৯৯১৫৯৩

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
স্বত্ব : সংরক্ষিত
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আযহার
বাংলাবাজার, বাড্ডা, যাত্রাবাড়ী
০১৭১৫ ০২৩১১৮, ০১৯৪৭ ৫৫৫১৯৭

অনলাইন পরিবেশক : rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১৩৫ টাকা

Book : **AL AQEEDATUL HASANAH**
By : Imam shah Waliullah Dehlavi
Translated by : Ali Hasan Osama

Publised by : **Prottoy**
Islami Tower, Banglabazar, Dhaka
01743 784550, 01746 991593

Facebook : /Prottoy.prokason
Email : prottoyprokason@gmail.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, exept in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

বিষয়সূচি

লেখক পরিচিতি

কুতুব উদ্দিন আহমাদ ইবনু আবদুর রহিম। যিনি শাহ ওয়ালি উল্লাহ নামে পরিচিত (১৭০৩-১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দ/১১১৪-১১৭৬ হিজরি) ছিলেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের একজন ইসলামি পণ্ডিত, সংস্কারক এবং আধুনিক ইসলামি চিন্তার একজন প্রতিষ্ঠাতা। সাম্প্রতিক পরিবর্তনের আলোকে তিনি ইসলামি আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর চার বছর পূর্বে ১৭০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বংশতালিকা সাহাবি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর পরিবার পর্যন্ত পৌঁছায়। দিল্লিতে তার পিতা শাহ আবদুর রহিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা লাভ করেন। কুরআনের পাশাপাশি তিনি আরবি ও ফারসি ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং উচ্চস্তরের দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, অতীন্দ্রিয়তা ও আইনশাস্ত্রের ওপর পাঠ নেন। ১৫ বছর বয়সে তিনি এখান থেকে উত্তীর্ণ হন। একই বছর তার পিতা তাকে নকশবন্দিয়া তরিকায় পদার্পণ ঘটান। মাদরাসায়ে রহিমিয়াতে তিনি তার পিতার অধীনে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৭১৮ সালের শেষের দিকে পিতার মৃত্যুর পর তিনি মাদরাসার প্রধান হন এবং বারো বছর যাবৎ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করেন। এসময় তিনি তার নিজস্ব পড়াশোনা চালিয়ে যান। শিক্ষক হিসেবে তার সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষার্থীরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

১৭২৪ সালে তিনি হজ পালনের জন্য হেজাজ গমন করেন। তিনি সেখানে আট বছর অবস্থান করেন এবং আবু তাহের বিন ইবরাহিম কুর্দি মাদানির মতো পণ্ডিতদের কাছ থেকে হাদিস ও ফিকহ শিক্ষালাভ করেন। এসময় তিনি মুসলিম বিশ্বের সকল প্রান্তের লোকের সংস্পর্শে আসেন এবং বিভিন্ন মুসলিম

দেশের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন। এসময় তিনি ৪৭টি আধ্যাত্মিক বিষয় দেখতে পান, যা তার বিখ্যাত রচনা 'ফুয়ুযুল হারামাইন'-এর বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

১৭৩২ সালে তিনি দিল্লি ফিরে আসেন এবং ১৭৬২ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জীবনের বাকি সময় এখানে অতিবাহিত করেন ও লেখালেখি চালিয়ে যান। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অধিবিদ্যাসহ সম্পূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়েও তিনি লিখেছেন। ইসলামের প্রকৃত ও আদিরূপ বিষয়ে তার মত তিনি এসব লেখায় তুলে ধরেন।

মারাঠা শাসন থেকে ভারতকে জয় করার জন্য তিনি আহমেদ শাহ দুররানির কাছে চিঠি লেখেন। তিনি আরবি থেকে ফারসিতে কুরআন অনুবাদ করেন, যাতে মুসলিমরা কুরআনের শিক্ষা বুঝতে পারে। অবশেষে ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মহান প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহজীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন।

অনুবাদকের কথা

আকিদাতুল-আলহাসানাহ। মহান ইমাম ও মুজাদ্দিদ শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ.-এর কালজয়ী রচনা। এটি মূলত একটি পুস্তিকা, যেখানে শাহ সাহেব রহ. সংক্ষেপে তার গুরুত্বপূর্ণ কিছু আকিদা তুলে ধরেছেন। যে আকিদাগুলো উচ্চারণে সহজ হলেও অনেক বিজ্ঞজনেরও তাতে পদস্খলন ঘটেছে। শাহ সাহেব রহ. অতি সংক্ষেপে কোনো প্রকার শিরোনাম ও দালিলিক বিশ্লেষণ ছাড়াই আকিদাগুলো একের পর এক বয়ান করেছেন। আমরাও শুধু তার বক্তব্যের আক্ষরিক অনুবাদের ওপর ক্ষান্তি দিলে বইটির কলেবর সর্বোচ্চ এক ফর্মা হতো। কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ পাঠকের জন্যই তখন তা দুর্বোধ্য হয়ে যেত। আর উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানী পাঠক যারা, তাদের জন্যতো মূল গ্রন্থই রয়েছে। আলাদাভাবে অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশ করারও কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এ জন্য সাধারণ পাঠকদের কথা বিবেচনা করে আমরা এখানে শুধু আক্ষরিক অনুবাদ করেই ক্ষান্তি দিইনি; বরং প্রায় প্রতিটি আকিদার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংযুক্ত করে দিয়েছি। ব্যাখ্যা সংযোজনের ক্ষেত্রেও আমরা চেষ্টা করেছি নতুন ধারার সূত্রপাত না করে লেখকের ধারায়ই আলোচনাকে এগিয়ে নেওয়ার। শেষের দিকের যেসব জায়গায় ব্যাখ্যা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে মূল বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার কারণেই এমনটি করেছি। ব্যাখ্যাগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা নিজেদের গবেষণার ওপর চূড়ান্ত নির্ভর করিনি। তাই অধিকাংশ জায়গায় নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া মহান লেখকের উত্তরসূরি আকাবির আলিমগণের বক্তব্যগুলোকেই কেবল উদ্ধৃত করেছি। এ ক্ষেত্রে আমরা সবচে বেশি উপকৃত হয়েছি আল্লামা ইদরিস কান্ধলবি রহ.-এর *আকায়েদুল ইসলাম* গ্রন্থ থেকে। যার কারণে মোটামুটি নির্ভরতার সঙ্গে এ কথা বলা যায়, পাঠক এ পুস্তিকাটি পড়লে শুধু একজন

লেখকের আকিদার সঙ্গেই নয়; বরং একটি ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। এ বইয়ে উল্লেখিত আকিদাগুলোই আমাদের আকিদা, আমাদের আকাবিরগণের আকিদা, উপমহাদেশীয় দেওবন্দি আলিমগণের আকিদা।

আমরা বইটিকে সরাসরি আরবি থেকে অনুবাদ করেছি। সাথে সহায়ক হিসেবে মাওলানা আবদুল হামিদ সোয়াতি রহ.-এর উর্দু অনুবাদটিও পাশে রেখেছি। মূল গ্রন্থটি আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলোতে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এর দুটো পিডিএফ কপির ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে।

বইটি একবার অধ্যয়ন করে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা হয়তো দুষ্কর হবে। নিরিবিলি পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে অন্তর খুলে বইটি একাধিকবার পাঠ করা হলে আশা করি এর মণি-মুক্তাগুলো চোখের সামনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। আল্লাহ তাআলা এ বইটিকে কবুল করে নিন।

বইটির ব্যাখ্যা সংযোজন করতে গিয়ে আমরা যাদের রচনা থেকে উপকৃত হয়েছি, তাদের যথাযোগ্য প্রতিদান দান করুন। এ বইটির সঙ্গে যারা যেভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে, সকলের প্রচেষ্টাকে তিনি উত্তমরূপে কবুল করুন। এ মাটিতে সহিহ আকিদার পতাকা সমুন্নত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আলী হাসান উসামা
০৩-০১-২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
alihasanosama.com

আমি মহান আল্লাহ তাআলা এবং উপস্থিত ফেরেশতা, জিন এবং মানুষকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি অন্তরের গভীর থেকে বিশ্বাস করি:

পৃথিবীর রয়েছে একজন সৃষ্টিকর্তা

১. পৃথিবীর একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন।

ব্যাখ্যা : এই বিশ্ব ও বিশ্বের কোনো বস্তুই এমনিতে সৃষ্টি হয়ে যায়নি। যদি কোনো বস্তু নিজে নিজে সৃষ্টি হয়ে যেতত‌বে সেটি হতো স্বয়ং খোদা। কারণ, খোদা মানেই হলো এমন কেউ, যিনি আপন সত্তায় ভাস্বর, স্বয়ম্ভু। এ ছাড়াও সে বস্তু আর কারও মুখাপেক্ষী হতো না এবং কারও অধীনও হতো না। অথচ আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত কোনো বস্তুই গতিহীন নয়। এই গতি ও ক্রিয়া ছয় ধরনের হয়ে থাকে—অস্তিত্ব লাভের ক্রিয়া, বিনাশ ক্রিয়া, প্রবৃদ্ধিমূলক ক্রিয়া, ক্রটিজনিত ক্রিয়া, অনতিক্রমনীয় ক্রিয়া এবং স্থানান্তর ক্রিয়া। পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো গতি এক অবস্থায় ও এক ধারায় থাকে না। এতে বোঝা যায়, কোনো বস্তুর গতিই তার নিজস্ব নয়; বরং তার বাইরের কোনো সত্তা কর্তৃক গতিদান করায় তা গতিশীল। সারা বিশ্বের সকল বস্তুর গতি যার নিয়ন্ত্রণে, তিনিই হচ্ছেন মূল গতিদানকারী সত্তা। আর তিনিই আল্লাহ।

মহান আল্লাহ এক। তার কোনো অংশীদার নেই। অংশীদারত্ব ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলার পরিচায়ক। আল্লাহ তাআলা সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র। এ ছাড়াও আরেকজন অংশীদারের তখনই প্রয়োজন হয় যখন স্রষ্টার মধ্যে পূর্ণতা ও স্থায়িত্ব না থাকে এবং যখন তার মধ্যে অস্তিত্বের অপরিহার্যতা ও প্রভুত্ব সম্পর্কে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যখন তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী হন তখন অন্য কোনো অংশীদারের অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক বিবেচিত হয়। আর যা অতিরিক্ত ও অহেতুক, তা কখনো প্রভু হতে পারে না। সুতরাং অংশীদারত্ব মেনে নিলে দু-জন অংশীদারের মধ্যে একজন দোষযুক্ত ও অন্যজন অপেক্ষা কম মর্যাদাবান হওয়া স্বাভাবিক; যা একচ্ছত্র প্রভুত্ব ও অপরিহার্য অস্তিত্বের পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা তার অংশীহীনতাই প্রমাণ করে।

তিনি চিরন্তন ও অনাদি

২. যিনি চিরন্তন ও অনাদি। যিনি সর্বদা ছিলেনএবং সর্বদা থাকবেন।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ চিরন্তন ও অনাদি। অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্বের কোনো শুরু বা শেষ নেই। তিনি চিরন্তন। তিনিই আদি। তিনিই অন্ত। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির জন্য জন্য 'চিরন্তন' ও 'অনাদি' বিশেষণ দুটো প্রযোজ্য ও প্রমাণিত নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুই চিরন্তন হতে পারে না। কারণ, তিনি ছাড়া আর কোনো কিছু দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। তিনি ছাড়া সবকিছুই পরনির্ভর, অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিযুক্ত। আর এ-জাতীয় বিশেষণের অধিকারী কোনো কিছু কখনো চিরন্তন হতে পারে না। সুতরাং আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সবই মহান প্রতিপালকের সৃষ্ট। এসব কিছুর আদি রয়েছে, অন্ত রয়েছে। একমাত্র তিনিই অনাদি, অনন্ত।

তাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী

৩. তার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। তাঁর অনস্তিত্ব অসম্ভব।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর চিরন্তন সত্তা ও গুণাবলির সঙ্গে স্বয়ং বিরাজমান। তিনি ছাড়া অন্যসব বস্তু তার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এবং অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে। আল্লাহ তাআলা নিজ সত্তায় ভাস্বর, তিনি স্বয়ম্ভু। তাঁর সত্তা ও গুণাবলি ছাড়া সারা বিশ্ব ও বিশ্বের মধ্যস্থিত সকল বস্তু উদ্ভাবিত ও সৃষ্ট। এ সবকিছুই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে। এ জন্যই বিশ্বের কোনো বস্তু সবসময় এক অবস্থায় থাকে না। পরিবর্তন ও বিবর্তনের এক কেন্দ্রবিন্দু এই পৃথিবী।ধ্বংস ও বিনাশের ক্ষেত্রভূমিরূপে প্রতিভাত এর সবকিছু। বিশ্বের যে বস্তুর দিকেই দৃষ্টি ফেরানো হয়, সবকিছুর মধ্যেই মুখাপেক্ষিতা, দীনহীনতা, অক্ষমতা এবং অসহায়ত্ব পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলাই হলেন প্রকৃত মালিক; যেহেতু তিনি সকল অস্তিত্বের মালিক। এ জন্য তাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য। তাঁর অনস্তিত্ব অসম্ভব। কারণ, এর অন্যথা হওয়া যদি সম্ভব হতো তাহলে তিনি আর সবকিছুর স্রষ্টা হতে পারতেন না। সবকিছুর স্রষ্টা হওয়ার জন্য অপরিহার্য গুণ হলো, তিনি সর্বদা অস্তিত্ববান থাকবেন। কখনো তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে না।

তিনি মহান

৪. তিনিই বড়, সুউচ্চ, শ্রেষ্ঠত্বের সকল বিশেষণে বিশেষায়িত, ত্রুটি এবং বিলুপ্তির সকল নিদর্শন থেকে পবিত্র।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ গুণাবলি তার সৃষ্টিজীবের মধ্যেও বিদ্যমান। সকল জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণ গুণ রয়েছে। যদি স্রষ্টার মধ্যে পূর্ণতা না থাকত তাহলে তা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কীভাবে আসে? আল্লাহ তাআলা তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলির নিদর্শন মানুষের মধ্যে এ জন্যই সৃষ্টি করেছেন, যেন মানুষ তা প্রত্যক্ষ করে আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে নির্দ্বিধ স্বীকারোক্তি দিতে পারে। আর তা না-হলে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর গুণের সঙ্গে মানুষের গুণের কোনো তুলনাই হতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা ত্রুটি এবং বিলুপ্তির সকল নিদর্শন থেকে পবিত্র। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা। কিন্তু হাল জামানার কোনো কোনো সহিহ আকিদার দাবিদার বলতে চায় যে, আমরা আল্লাহ তাআলা থেকে একমাত্র তা-ই নিরোধ করতে পারব, যা তিনি নিজের থেকে কিংবা তাঁর রাসুল ﷺ সহিহ হাদিসে তার থেকে নিরোধ করেছেন। এ ছাড়া অন্য কিছু আমরা তার থেকে নিরোধ করতে পারব না। এ কথা যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে বাতিলপন্থীরা আল্লাহ তাআলার দিকে অনেক ত্রুটির নিদর্শনকে সম্পর্কিত করতে থাকবে। আর তাদের সেই কথা খণ্ডন করার মতো কোনো যুক্তিও আমাদের কাছে থাকবে না।

এখানে আল্লাহ তাআলা যেসব গুণ বর্ণিত হয়েছে, এ সবকিছুই স্রষ্টার অপরিহার্য গুণ। এর ব্যতিক্রম হলে কেউ স্রষ্টা হতে পারে না।

সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা

৫. তিনি সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা।

ব্যাখ্যা : সকল সৃষ্টি—তা বস্তুই হোক আর বস্তুর গুণই হোক, শারীরিক অবয়ব হোক এবং জ্ঞান হোক, তেমনি আকাশ, পৃথিবী, তারকারাজি বা অন্য যেকোনো উপাদান হোক—একমাত্র মহান আল্লাহর সৃষ্টির মাধ্যমে অস্তিত্বহীন

আবর্ত থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। অনুরূপ সকল সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন এবং এগুলোর গুণাগুণ ও অবস্থাও আল্লাহ উদ্ভাবন করার ফলে উদ্ভাবিত হয়েছে। কোনো একক বস্তু হোক বা যৌগিক বস্তু, সব তাঁরই আবিষ্কার। গরম অথবা ঠান্ডা উভয় উপাদানই তাঁর সৃষ্টি। আগুন ও পানি যেমন তাঁর দান, তেমনি আগুনের উষ্ণতা এবং পানির শীতলতাও তার সৃষ্টি। কোনো বস্তুই তাঁর ইচ্ছামতো গরম বা ঠান্ডা হতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুর বৈশিষ্ট্য এবং তার বিশেষ শক্তি সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি।

মহান আল্লাহ তাআলা ভালো-মন্দ উভয়টির স্রষ্টা। কিন্তু তিনি ভালো-মন্দ উভয়টির স্রষ্টা হলেও তিনি ভালোর প্রতি সন্তুষ্ট এবং মন্দের প্রতি অসন্তুষ্ট। আলো ও অন্ধকার, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা, ফেরেশতা ও শয়তান, নেক ও বদ ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্ট। কিন্তু তিনি নেকির প্রতি সন্তুষ্ট এবং মন্দ কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট।

মহান আল্লাহ তাআলা সকল বান্দার স্রষ্টা। তদুপরি তাদের চরিত্র, অভ্যাস, গুণ ও সকল কর্মকাণ্ডেরও স্রষ্টা। সকল ভালো-মন্দ কর্মকাণ্ড তার নির্ধারণ, জ্ঞান ও ইচ্ছার দ্বারা সংঘটিত হয়। কিন্তু ভালো কাজের প্রতি রয়েছে তার সন্তুষ্টি এবং মন্দ কাজের প্রতি রয়েছে তার অসন্তুষ্টি।

তিনি সর্বজ্ঞানী

৬. সকল বিষয়ের জ্ঞানী।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ তাআলার সার্বিক জ্ঞান রয়েছে। আকাশ ও জমিনের কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুও তার জ্ঞানের পরিসীমার বাইরে নয়। যেহেতু তিনি সকল বস্তুর স্রষ্টা, তাই সকল বস্তু সম্পর্কে অবশ্যই তাঁর জ্ঞান রয়েছে। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবেন না, এটা হতে পারে না। কুরআনে এসেছে :

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।[১]

[১] সুরা মুলক : ১৪

আল্লাহ তাআলার জ্ঞানসম্পর্কিত গুণ প্রশ্নাতীত। এতে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কিংবা অগ্র-পশ্চাতের কোনো নিয়ম-পদ্ধতি কার্যকর নয়। কারণ, তিনি অনাদি এবং অনন্তকালের সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তার জ্ঞান স্বপ্রকাশিত, সকল সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত এবং এই সংযুক্তি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজমান।

তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী

৭. সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ তাআলা মহাশক্তির আধার। তিনি প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতা থেকে পবিত্র। তিনি সারা বিশ্বের মালিক এবং অসীম শক্তির অধিকারী। সকল বান্দা তার অধীনস্থ দাস। কুরআন মাজিদে তিনি বলেন :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহরই জন্য আকাশসমূহ ও ভূমির রাজত্ব। আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।[২]

তিনি তাঁর কোনো কাজে উপকরণের মুখাপেক্ষী নন। কোনো উপকরণ ছাড়াই তাঁর সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে। সর্ববিষয়ে তিনি ক্ষমতাবান। আল্লাহ বলেন :

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ

বলে দিন, তিনি তো সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।[৩]

আল্লাহ তাআলা পূর্ণ ও স্বয়ংক্রিয় শক্তির অধিকারী। তাঁর ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতা, ত্রুটিমুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা।

আমরা আল্লাহ তাআলাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করি। তিনি ছাড়া অন্য কারও সার্বভৌমত্ব রয়েছে—এ আকিদা কেউ রাখলে তা

[২] সুরা আলে ইমরান : ১৮৯
[৩] সুরা আনআম : ৬৫

শিরক হিসেবে বিবেচিত হবে। তাগুতি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রকেও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হয়ে থাকে; শরিয়তের দৃষ্টিতে যা স্পষ্ট শিরক।

তিনি একচ্ছত্র ইচ্ছাশক্তির অধিকারী

৮. তিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলের (অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্ব)-এর ইচ্ছাকারী।

ব্যাখ্যা : কারণ, এই বিশ্ব-চরাচরে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই হয় না, হতে পারে না। কুরআন মাজিদে আল্লাহ বলেন :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۞ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً

'আর তাঁরই কাছে আছে অদৃশ্যের কুঞ্জি। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে, সে সম্পর্কে তিনি অবহিত। কোনো গাছের এমন কোনো পাতা ঝরে না, যে সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত নন। মাটির অন্ধকারে কোনো শস্যদানা অথবা আর্দ্র বা শুষ্ক এমন কোনো জিনিস নেই, যা এক উন্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাতের বেলা (ঘুমের ভেতর) তোমাদের আত্মা (মাত্রাবিশেষে) কব্জা করে নেন এবং দিনের বেলা তোমরা যা কিছু করো, তা তিনি জানেন। তারপর (নতুন) দিনে তোমাদেরকে নতুন জীবন দান করেন, যাতে (তোমাদের জীবনের) নির্ধারিত কাল পূর্ণ হতে পারে। তারপর তার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তোমরা যা করতে, তিনি তোমাদের তা অবহিত করবেন। তিনিই নিজ বান্দাদের ওপর পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের জন্য রক্ষক (ফেরেশতা) প্রেরণ করেন।'[৪]

আল্লাহ তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি যা কিছু করেছেন, সবকিছুর সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু অস্তিত্বে আসতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করেন, তারপর সৃষ্টি করেন। এমন হয় না যে, তিনি কোনো কিছু ইচ্ছা করেন আর তা হয় না। কুরআনে এসেছে :

فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ

তিনি যা ইচ্ছা করেন, সর্বদা তা-ই করেন।[৫]

আল্লাহ তাআলা সকলের অধিপতি এবং সবকিছুর প্রকৃত মালিক। তাই তিনি যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা তৈরি করেন। তিনি সবকিছুর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও সবকিছু পরিচালনার ব্যাপারে একচ্ছত্র ইচ্ছার অধিকারী।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

তোমার প্রতিপালক যা চান এবং যা ইচ্ছা করেন, তিনি তা সৃষ্টি করেন। তাদের কোনো এখতিয়ার নেই। তারা যা কিছু শিরক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।[৬]

তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, তিনি যেমন ইচ্ছা, তেমন হুকুম করবেন। যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে হস্তক্ষেপ করবেন। কেউ তাঁর হুকুম ও হস্তক্ষেপে বাঁধ সাধতে পারবে না। তিনি রাজাধিরাজ। তাই যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করবেন। যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেবেন।

---

[৪] সুরা আনআম : ৬১-৫৯

[৫] সুরা বুরুজ : ১৬

[৬] সুরা কাসাস : ৬৮

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

বলুন, হে আল্লাহ! হে সার্বভৌম শক্তির মালিক! আপনি যাকে ইচ্ছা করেন, ক্ষমতা দান করেন আর যার থেকে ইচ্ছা করেন, ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা করেন, সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন, লাঞ্ছিত করেন। যাবতীয় কল্যাণ আপনার হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। আপনিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আপনিই নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে প্রাণবান বস্তু বের করেন এবং প্রাণবান বস্তু থেকে নিষ্প্রাণ বস্তু বের করেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন, অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।[৭]

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

কল্যাণের আধার হয়েছেন সেই সত্তা, যার হাতে সর্বময় ক্ষমতা। আর তিনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ শক্তিমান।[৮]

তিনি চিরঞ্জীব, সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা

৯. তিনি চিরঞ্জীব, সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব। তিনি অনাদি ও অনন্ত। আল্লাহ তাআলা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। তাঁর অস্তিত্ব অনাদিকাল থেকে বিরাজমান। তাঁর অস্তিত্ব কখনো অনস্তিত্ব ছিল না। তাঁর সত্তা অনাদি। আল্লাহ বলেন :

[৭] সুরা আলে ইমরান : ২৬-২৭
[৮] সুরা মুলক : ১

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

তিনিই আদি এবং তিনিই অন্ত।[৯]

তাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণেই তাঁর অস্তিত্ব সর্বদা টিকে থাকবে। অর্থাৎ, তিনি অনন্ত। তাঁর অস্তিত্বে যেমন কখনো অনস্তিত্ব ছিল না, তেমনি কখনো অনস্তিত্ব আসবেও না। আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্যকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল। তাঁরই জন্য শাসনকর্তৃত্ব। তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।[১০]

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

বাকি থাকবে কেবল তোমার প্রতিপালকের গৌরবময়, মহানুভব সত্তা।[১১]

আল্লাহর সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো কিছু অনাদি নয়। যারা সৃষ্টির মৌলিক উপাদান, রূপ, বুদ্ধি ও আকাশসমূহকে অনাদি বলে থাকে, ইমাম গাজালির মতানুসারে তারা কাফির।

আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব না হলে পরবর্তীতে সৃষ্টি হওয়ায় তিনি আর সবকিছুর স্রষ্টা প্রতীয়মান হতেন না; বরং তিনি নিজেই মাখলুক তথা সৃষ্ট হিসেবে প্রতীয়মান হতেন।

আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। প্রত্যেক সৃষ্ট জীবন ও সৃষ্ট বস্তুর স্বর ও আবেদন তিনি শুনতে পান। জমিনে হোক অথবা আসমানে হোক, এমনকি

[৯] সুরা হাদিদ : ৩
[১০] সুরা কাসাস : ৮৮
[১১] সুরা রহমান : ২৭

জমিনের সপ্তম স্তরের নিচে ছোট্ট পিঁপড়ার পায়ের শব্দও তিনি শুনতে পান। সারা বিশ্বে একই সময়ে অনুরণিত সকল শব্দ তিনি একসাথে শুনতে সক্ষম। একসাথে সারা বিশ্বের সকল বস্তু তিনি দেখতে পারেন। কোনো পর্দা বা কোনো অন্ধকার তাঁর অবারিত দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এসবই তাঁর প্রভুত্বের অপরিহার্য গুণাবলি।

তিনি অনন্য ও অদ্বিতীয়

১০. তাঁর কোনো সাদৃশ্য নেই। তাঁর কোনো বিরোধী নেই। তাঁর কোনো প্রতিপক্ষ নেই। তাঁর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহর সমতুল্য ও সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর কোনো স্ত্রী নেই এবং কোনো পুত্র নেই। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে তুলনাহীন ও অতুলনীয়। আমরা শুধু এতটুকু জানি যে, আল্লাহ তাআলা সকল গুণের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং আমাদের বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান ও কল্পনায় যা এসে থাকে, সেসব থেকে আল্লাহ পবিত্র এবং অন্যান্য। আমরা যা কিছু কল্পনা করি, সবই ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আর যিনি কল্পনাতীত, তিনিই মহান আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলার কোনো সন্তান নেই। তার কোনো সন্তান থাকা সংগতও নয়। কারণ, সন্তান সাধারণত পিতার সমজাতীয় হয়ে থাকে। যেমন, আলী হাসান উসামা যদিও আচার-আচরণে ও স্বভাবে তার পিতা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির; কিন্তু মানুষ হওয়ার প্রশ্নে দু-জনই সমগোত্রীয়। অর্থাৎ, উভয়েই মানুষ। অনুরূপভাবে কেউ যদি আল্লাহর পুত্র হয় তবে সে-ও প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর শরিক হবে এবং আল্লাহর মতো সে-ও একজন আল্লাহ হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

'তোমরা নিবৃত্ত হও। তা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একমাত্র ইলাহ। তিনি যেকোনো সন্তান থেকে পবিত্র। আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং ভূমিতে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।'[১২]

আল্লাহ তাআলার গুণাবলির স্তর ও সাদৃশ্যমূলক নিগূঢ় গুণাবলি সম্পর্কেও আমাদের স্বচ্ছ ধারণা রাখা অত্যাবশ্যক। আল্লামা ইদরিস কান্ধলবি রহ. লেখেন :

'কুরআন মাজিদ ও হাদিসে বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলিসমূহ দু-ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের গুণাবলির অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকাশিত। যেমন, ইলম (জ্ঞান), কুদরত (ক্ষমতা), ইরাদা (ইচ্ছা) ও কালাম (কথা বলা) ইত্যাদি। এগুলোকে সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট গুণাবলি বলা হয়। এই বিষয়ে সত্য পথের অনুসারীরা একমত যে, এসব গুণাবলির বাহ্যিক অর্থের ওপর বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য এবং এসব গুণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা তর্কের অবতারণা করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয় ভাগের গুণাবলিতে গোপনীয়তা ও অস্পষ্টতা বিদ্যমান। ফলে এর শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ দ্বারা কোনো নিশ্চিত ও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি বা অনুমানের কোনো স্থান নেই। কাশফ ও ইলহামও এখানে কার্যকর নয়। যেমন, ওয়াজহ (শাব্দিক অর্থ : চেহারা), ইয়াদ (শাব্দিক অর্থ : হাত), নাফস (শাব্দিক অর্থ : আত্মা),আইন (শাব্দিক অর্থ : চোখ), সাক (শাব্দিক অর্থ : পায়ের গোছা), আসাবি (শাব্দিক অর্থ : আঙুল) এবং আরশের ওপর ইসতিওয়া গ্রহণ করা (শাব্দিক অর্থ : উপবেশন করা, সমুন্নত হওয়া) ইত্যাদি। এ ধরনের গুণকে সাদৃশ্যমূলক নিগূঢ় গুণ বলা হয়।

আল্লাহ তাআলার এই গুণের আলোচনায় দার্শনিকগণ তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন। প্রথম দল মুজাসসিমা ও মুশাববিহাদের, দ্বিতীয় দল কাদরিয়্যা ও মুতাজিলাদের এবং তৃতীয় দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের।

প্রথম দলের বিবরণ : মুশাববিহাদের মুজাসসিমাও বলা হয়ে থাকে। মুশাববিহারা এ-জাতীয় বিবরণ-সংবলিত আয়াত ও হাদিসকে বাহ্যিক অর্থে

[১২] সুরা নিসা : ১৭১

প্রয়োগ করার ব্যাপারে এত বাড়াবাড়ি করেছে যে, তারা আল্লাহ তাআলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাত, মুখ ও পা ইত্যাদি রয়েছে বলে মনে। একইভাবে কোনো বাদশাহ যেমন সিংহাসনে উপবেশন করে, তেমনি আল্লাহ তাআলাও আরশে উপবেশন করে আছেন বলে মনে করে। এই মতাবলম্বীরা কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রাখে। তারানির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা বা অবহেলাবশত আল্লাহকে শারীরিক অবয়বের অধিকারী বলে মনে করে।

আল্লাহ বলেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।[১৩]

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

তাঁর সমকক্ষ কেউই নয়।[১৪]

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى

সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুণাবলি আল্লাহরই রয়েছে।[১৫]

দ্বিতীয় দলের বিবরণ : মুতাজিলারা মুশাববিহাদের বিপরীত মনোভাব পোষণ করে। তারা আল্লাহ তাআলার প্রকাশ্য নির্দেশের বাহ্যিক অর্থের বিরোধিতা এবং প্রকৃত অর্থের স্থলে রূপক অর্থ নেওয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে। তারা বাহ্যিক অর্থের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলিকে রীতিমতো অস্বীকার করে। তারা কোনো যুক্তি-প্রমাণ ব্যতিরেকে কুরআন-হাদিসের যেখানে আল্লাহর কোনো প্রসঙ্গে ইয়াদ (শাব্দিক অর্থ : হাত) শব্দ এসেছে, সেখানে তাকে শক্তি, কুদরত ও নিয়ামত অর্থে বিশ্লেষণ করেছে। অথচ কুরআন মাজিদ এ ধরনের অনুমাননির্ভর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার অনুমোদন

[১৩] সুরা শুরা : ১১
[১৪] সুরা ইখলাস : ৪
[১৫] সুরা নাহল : ৬০

দেয় না। কারণ, কুরআন মাজিদে 'ইয়াদ' শব্দের দ্বিবচন 'ইয়াদাইন' শব্দও এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

আমি যাকে আমার দু-'ইয়াদ' দ্বারা সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে কোন জিনিস তোমাকে বাধা দিলো?[১৬]

এখানে 'ইয়াদ' অর্থ কুদরত নেওয়া সঠিক হবে না। কারণ, এই আয়াতে 'ইয়াদ' শব্দটি দ্বিবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ স্পষ্টত আল্লাহ তাআলা একক কুদরতের অধিকারী। এখানে কুদরতের দ্বিত্ব অর্থ নেওয়া ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত এই কালামের দ্বারা আদম আ.-এর মর্যাদা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। যদি এই আয়াতে 'ইয়াদ' অর্থ কুদরত করা হয় তাহলে আদম আ.-এর মর্যাদা প্রকাশ পাবে না। কারণ, শয়তানও আল্লাহর কুদরতের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি সকল জিন, জীব-জন্তু ও জড়বস্তুকেও তাঁর কুদরতের দ্বারাই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আদম আ.-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব কোথায়? সকল কিছুই তো আল্লাহর কুদরতের সৃষ্টি।

অনুরূপভাবে 'ইয়াদ'কে নেয়ামত অর্থেও ব্যবহার করা সঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলার নেয়ামত একটি বা দুটো নয়; বরং অগণিত, অসংখ্য, সংখ্যাতীত। 'আল্লাহর নেয়ামত অসংখ্য' এমন বলা যায়। কিন্তু আল্লাহর 'ইয়াদ' অসংখ্য কোনো অবস্থায়ই বলা যাবে না। মোটকথা, মুশাববিহাদের মতো মুতাজিলারাও পথভ্রষ্ট।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত : সত্যানুসন্ধানী এই দলের বক্তব্য হলো, উপরিউক্ত দুটো দলই পথভ্রষ্ট। মুশাববিহারা কুরআন মাজিদের আয়াত لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।'[১৭] -এর বক্তব্য অস্বীকার করে। আর মুতাজিলারা সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতসমূহকেই অস্বীকার করে। আল্লাহর কালাম—তা দ্ব্যর্থহীন আয়াত কিংবা সাদৃশ্যপূর্ণ যা-ই হোক না কেন—অস্বীকার করা পথভ্রষ্টতার শামিল। সত্যের অনুসারীরা বলে, ওইসব সাদৃশ্যমূলক গুণ যে

[১৬] সুরা সোয়াদ : ৭৫
[১৭] সুরা শুরা : ১১

আল্লাহ তাআলার রয়েছে, তা মানতে হবে এবং নিজস্ব অভিমত, অনুমান, কাশফ ও ইলহামের দ্বারা ওইসব গুণের রহস্য জানার চেষ্টা করা যাবে না। কিতাব ও সুন্নাহর মধ্যে সাদৃশ্যমূলক নিপুণ গুণের যেভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে, বিনাবাক্যে তা মেনে নিতে হবে।

মুতাজিলাদের মতো যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা যাবে না। এরূপ করলে কাদরিয়্যা ও মুতাজিলাদের মতো এসব সাদৃশ্যমূলক গুণাবলি—যা কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত—অস্বীকার করার মতবাদ মেনে নিতে হবে। একইভাবে মুশাববিহা ও মুজাসসিমাদের মতো এমনও বলা যাবে না (আল্লাহ রক্ষা করুন), 'এগুলো আল্লাহ তাআলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আল্লাহ তাআলার দেহের অংশ' এবং 'আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর সমাসীন রয়েছেন'। এরকম বললে তা আল্লাহর পবিত্র আয়াতের অস্বীকৃতি বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ তাআলার যেসব গুণ কুরআন-হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত, সেসব গুণের ওপর বিশ্বাস করতে হবে এবং সেগুলোর অন্তর্নিহিত রহস্য আল্লাহ জানেন—এটা মানতে হবে। আল্লাহর পবিত্রতা ও অদ্বিতীয়তা সম্পর্কে দৃঢ় সমর্থনের সাক্ষ্যস্বরূপ 'তাঁর অনুরূপ কোনো কিছুই নেই' মুখে উচ্চারণ করতে হবে এবং অন্তরের দ্বারা গভীরভাবে বিশ্বাস করতে হবে। জ্ঞানী ও পণ্ডিতরা যেভাবে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু শ্রবণ করেন, দেখেন এবং তাঁর শোনা ও দেখা আমাদের শোনা ও দেখার মতো নয়; অনুরূপভাবে তাঁর 'ইয়াদ' ও 'কাদাম' আমাদের হাত ও পায়ের মতো নয়[১৮], আমাদেরও তেমনি এসব গুণের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

সত্যের অনুসারীগণ মুতাজিলাদের মতো বাহ্যিক অর্থের বিরোধিতায় সীমাহীন বাড়াবাড়ি করেননি। মুশাববিহাদের মতো বাহ্যিক অর্থের সমর্থনে অহেতুক সীমালঙ্ঘনও করেননি; বরং তারা মধ্যবর্তী এমন পন্থা অবলম্বন করেছেন, যা সর্বজনগ্রাহ্যতা লাভ করেছে। সালাফে সালেহিনদের সকলে এবং চার ইমাম ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত উপরিউক্ত মতবাদ সমর্থন করেছেন। এ

[১৮] কারণ, আমাদের হাত ও পা হলো দেহের অঙ্গ। অথচ আল্লাহ তাআলার 'ইয়াদ' ও 'কাদাম' হলো তাঁর গুণ। সুতরাং আমাদের হাত ও পা আর তাঁর 'ইয়াদ' ও 'কাদাম' কখনো এক হতে পারে না। বস্তুত এ সকল সাদৃশ্যপূর্ণ গুণাবলির অন্তর্নিহিত মর্মের ব্যাপারে তিনিই সম্যক অবগত।

সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রহ. *আল-ফিকহুল আকবার* গ্রন্থে লেখেন, 'কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা যে ওয়াজহ (শাব্দিক অর্থ : চেহারা), ইয়াদ (শাব্দিক অর্থ : হাত), নাফস (শাব্দিক অর্থ : আত্মা), আইন (শাব্দিক অর্থ : চোখ) উল্লেখ করেছেন, এ সবই আল্লাহ তাআলার গুণাবলির রূপায়ণ। এমন বলা যাবে না যে, 'ইয়াদ' হলো তাঁর কুদরত এবং তাঁর নেয়ামত। কারণ, এরূপ অর্থ করলে আল্লাহর গুণকে বাতিল বলার শামিল হবে; যা কাদরিয়্যা ও মুতাজিলাদের মতাদর্শের অনুরূপ।এখানে বলতে হবে 'ইয়াদ' আল্লাহ তাআলার একটি গুণের নাম; অঙ্গের নাম নয়। তা পরিমাণ ও অবস্থাসূচক হওয়া থেকে পবিত্র।' এর প্রকৃত রহস্য একমাত্র আল্লাহ জানেন। এই মতবাদ ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমাদ রহ.-সহ হাদিসশাস্ত্রের অন্যান্য ইমামগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

বর্ণনা প্রদানে ও কথা বলায় অক্ষম কোনো ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও তাঁর পূর্ণতাকে সঠিকভাবে বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন। সে কেবলমাত্র আল্লাহর সম্ভাব্য গুণাবলির মধ্যে যে সব গুণকে উত্তম মনে করে, তা-ই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করবে। যখন পরস্পরবিরোধী গুণ বা দোষ-সংবলিত দুটো শব্দ আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয় তখন ওই দুটোর মধ্যে আল্লাহর জন্য অপরিহার্য সেই শব্দটিই ব্যবহার করবে, যা সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট। যেমন, অস্তিত্ববান ও অস্তিত্বহীন, সক্ষম ও অক্ষম, জ্ঞানী ও মূর্খ ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী অর্থজ্ঞাপক শব্দাবলির মধ্যে সর্বোত্তম শব্দ, অর্থাৎ অস্তিত্ববান, সক্ষম ও জ্ঞানী প্রভৃতি ব্যবহার করবে। আর তাকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমাদের পক্ষে এর চাইতে অধিক প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহর পবিত্রতম সত্তা মানুষের জ্ঞান ও কল্পনার ঊর্ধ্বে। আমরা যেসব বস্তুর কল্পনা করি, সেসব বস্তুর কোনোটির সঙ্গেই মহান আল্লাহ তাআলার সাদৃশ্য নেই। আমরা আল্লাহ তাআলার ঘোষণার আলোকে আল্লাহর শানে কেবল সেসব শব্দ ব্যবহার করব, যা মহানবি ﷺ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।' -সুরা শুরা : ১১

তাঁর কোনো অংশীদার নেই

১১. আল্লাহর কোনো অংশীদার নেই—অস্তিত্বের অপরিহার্যতা, ইবাদতের উপযুক্ততা, সৃষ্টি কিংবা পরিচালনার ক্ষেত্রে।

ব্যাখ্যা : যেহেতু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর আর কোনো অংশীদার নেই, তাই বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে। অন্য কারও ইবাদত করে না। তাওহিদুল কালিমার অর্থই হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকে ইবাদতের উপযুক্ত ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা। শরিয়তসম্মত উপায়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য কৃত সকল আমলকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা। এ তাওহিদই সকল নবি-রাসুলের দাওয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল।[১৯]

ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য সর্বপ্রথম কাজ হলো আল্লাহর তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাত মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া। এটা প্রমাণ করে যে, ইবাদতে আল্লাহর এককত্ব প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে রাসুলগণের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য। এই তাওহিদই হচ্ছে সে মূল বিষয়, যার ওপর সকল আমলের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল। এ তাওহিদ প্রতিষ্ঠিত না হলে কোনো আমলই শুদ্ধ হয় না। তাওহিদের এ দিকটি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে মানুষের মধ্যে তাওহিদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন চিন্তাভাবনা থেকেই যায়, যা শিরক বলে বিবেচিত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের মুশরিকরা তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ মেনে নিলেও এ প্রকারের তাওহিদকে মেনে নিতে পারেনি। এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের মুশরিক বলে অভিহিত করেছেন। তাওহিদের কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা মূলত এই তাওহিদকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তাওহিদের কালিমার মধ্যে দুটো দিক রয়েছে :

১. 'লা ইলাহা' বলার দ্বারা 'তাগুত'কে অস্বীকার করা হয়েছে।

[১৯] সুরা নাহল : ৩৬; সুরা আম্বিয়া : ২৫; সুরা আরাফ : ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; সুরা আনকাবুত : ১৬; সুরা জুমার : ১১; *সহিহ বুখারি* : ২৫, ৩৯২, ১৩৯৯, ২৯৪৬; *সহিহ মুসলিম* : ১৩৩-১৩৮

২. 'ইল্লাল্লাহ' বলার দ্বারা যাবতীয় ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সুতরাং কালিমা অস্বীকার এবং স্বীকারের সম্মিলন। আর এ দুটোই হলো কালিমার মূলভিত্তি। অস্বীকার ব্যতীত স্বীকার ধর্তব্য নয়। একইভাবে স্বীকার ব্যতীত অস্বীকারও গ্রহণীয় নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا

যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে, সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।[২০]

এ আয়াতে তাগুতকে অস্বীকার করা হলো কালিমার প্রথম মূলভিত্তি। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হলো কালিমার দ্বিতীয় মূলভিত্তি। আর উভয়টির ফলাফল হলো মজবুত রজ্জু আঁকড়ে ধরা। উল্লেখ্য, এখানে মজবুত রজ্জু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রথমে তাগুতকে অস্বীকার করবে, এরপর যাবতীয় ইবাদতকে আল্লাহর তাআলার জন্য সাব্যস্ত করবে, একমাত্র সে-ই কালিমা ধারণকারী হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۞ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

যারা তাগুতের ইবাদত পরিহার করেছে ও আল্লাহর দিকে অভিমুখী হয়েছে, সুসংবাদ তাদেরই জন্য। সুতরাং আমার সেই বান্দাদের সুসংবাদ শোনাও, যারা কথা শোনে মনোযোগ দিয়ে, এরপর তার মধ্যে যা কিছু উত্তম, তার অনুসরণ করে। তারাই সেই

[২০] সুরা বাকারাহ : ২৫৬

সব লোক, আল্লাহ যাদের হিদায়াত দিয়েছেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।[২১]

নবিগণের দাওয়াতের বিষয়টি হুবহু এভাবেই বিবৃত হয়েছে :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির ভেতর কোনো না কোনো রাসুল পাঠিয়েছি এই পথনির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে পরিহার করো। তারপর তাদের মধ্যে কতক তো এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন আর কতক ছিল এমন, যাদের ওপর বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে একটু পরিভ্রমণ করে দেখো, নবিদের অস্বীকারকারীদের পরিণতি কী হয়েছে।[২২]

তাগুত কী?

ইমাম তবারি রহ. বলেন :

'আমার মতে তাগুতের সঠিক সংজ্ঞা হলো, তাগুত হলো সে, যে আল্লাহর ওপর সীমালঙ্ঘন করে। ফলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার উপাসনা করা হয়—তার পক্ষ থেকে উপাসনাকারীকে বাধ্য করার কারণে অথবা উপাসনাকারীর তার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে। সেই উপাস্য হতে পারে মানুষ, শয়তান, মূর্তি, ভিন্ন কোনো পূজনীয় বস্তু অথবা অন্য যেকোনো কিছু।'[২৩]

[২১] সুরা জুমার : ১৭।
[২২] সুরা নাহল : ৩৬।
[২৩] *তাফসিরে তাবারি* : ৩/২১।

হাফিজ ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন :

'তাগুত হলো উপাস্য, অনুসরণীয় কিংবা মান্যবর শ্রেণির মধ্য থেকে এমন কেউ, যার ব্যাপারে বান্দা তার বন্দেগির সীমা লঙ্ঘন করে। সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাগুত হলো সেই ব্যক্তি, লোকেরা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের বিপরীতে যার কাছে বিচার প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলাকে ছেড়ে যার উপাসনা করে অথবা আল্লাহর বিধানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যার অনুসরণ করে বা এমন বিষয়ে তার আনুগত্য করে, যে বিষয়ে তারা জানে না যে, এটাই আল্লাহর আনুগত্য।'[২৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে, তারা আপনার প্রতি যে কালাম নাজিল করা হয়েছে, তাতেও ইমান এনেছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল করা হয়েছিল তাতেও; কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, তারা ফায়সালার জন্য তাগুতের কাছে নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে যেতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন সুস্পষ্টভাবে তাগুতকে অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান তাদের ধোঁকা দিয়ে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়।[২৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনু কাসির রহ. বলেন :

'এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তির দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, যে দাবি করে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের ওপর ও তাঁর পূর্ববর্তী নবিগণের ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন, সে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে; অথচ সে বিবদমান বিষয়াদিতে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের

[২৪] *ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন* : ১/৫০।
[২৫] সুরা নিসা : ৬০।

সুন্নাহকে ছেড়ে ভিন্ন কোনো কিছুর কাছে বিচার-ফায়সালা চায়। ...এ আয়াতটি প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে তিরস্কার করছে, যে কুরআন-সুন্নাহ থেকে ফিরে যায় এবং এ দুটো ব্যতিরেকে অন্য কোনো বাতিলের কাছে বিচার প্রার্থনা করে। (আর যার কাছে বিচার প্রার্থনা করে,) এ আয়াতে তাগুত দ্বারা সে-ই উদ্দেশ্য।'[২৬]

উপরিউক্ত আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার বিধানকে পেছনে ফেলে ভিন্ন কোনো বিধান দ্বারা বিচার-আচার করে, সে তাগুত। আর যারা এতটুকুতেই ক্ষান্ত থাকে না, বরং মহান প্রতিপালকের বিধানগুলোকে পরিবর্তন করে নিজেরাই বিধান রচনা করে, রাষ্ট্রে সে বিধানই বাস্তবায়ন করে, আল্লাহর বান্দাদের সে বিধান মানতে বাধ্য করে, তার বিধান মেনে না নিলে কঠোর শাস্তি প্রদান করে, তারা তো সাধারণ পর্যায়ের তাগুতই শুধু নয়; বরং তারা হলো চরম পর্যায়ের তাগুত।

সুতরাং যেসব শাসক ও বিচারক কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত বিচার-আচার করে, সুদের প্রচলন ঘটায়, মদ ও ব্যভিচারের লাইসেন্স দেয়, কুরআনে বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে; বরং কুরআন-সুন্নাহর আইনকে সেকেলে মনে করে, কখনো-বা মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে তামাশা করে, মানুষের ওপর গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের মতো সুস্পষ্ট কুফরি বিধান চাপিয়ে দেয় আর যারা পার্থিব স্বার্থে বিক্রিত হয়ে তাদের ইলমকে এসকল কুফরের সেবায় নিয়োজিত করে, মানুষকে নিজেদের ইলম দ্বারা বিভ্রান্ত করে, এদের প্রত্যেকেই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। বিশুদ্ধ ইমানের জন্য যেহেতু তাগুতকে বর্জন করা শর্ত, তাই উপরিউক্ত তাগুত গোষ্ঠীর থেকে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তাদের প্রত্যেকের বিরোধিতা করতে হবে। তাদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে। তাদের সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করা যাবে না, যা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। বরং ইবরাহিম আ.-এর মতো স্পষ্ট ভাষায় সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিতে হবে।[২৭]

---

[২৬] *তাফসিরে ইবনে কাসির* : ২/৩৪৬।

[২৭] বিস্তারিত জানতে পড়ুন—আমার অনূদিত *মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ* এবং স্বরচিত *সুরা ফাতিহার আলোকে ইসলামি আকিদা ও মানহাজ* এবং *ফিতনার বজ্রধ্বনি*।

সুতরাং তাওহিদুল উলুহিয়্যাহই দীন ইসলামের মূলকথা। সর্বপ্রকারের তাগুতকে বর্জন করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করাই এই তাওহিদের শিক্ষা। নবিজি ﷺ এই তাওহিদই প্রচার করে গেছেন। সাহাবিগণ রা. এ তাওহিদেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাগুতকে বর্জন করা, জাহেলি শাসনব্যবস্থাকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়নের ঘোষণার কারণেই মূলত মক্কার মুশরিকরা নবিজি ﷺ এবং সাহাবিগণ রা.-এর ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছিল। আজও যদি কেউ কালিমাকে সেই অর্থে বোঝে, যে অর্থে সাহাবিগণ বুঝেছিলেন; ওই তাওহিদকে গ্রহণ করে, যে তাওহিদকে সাহাবিগণ রা. গ্রহণ করেছিলেন, তাহলে তার অবস্থাও ঠিক তেমনই হবে, যেমন হয়েছিল সাহাবিগণ রা.-এর অবস্থা।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের ইমানের মেহনতের সাথিরাও কালিমার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার মূল অর্থ (অর্থাৎ তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ) বাদ দিয়ে শুধু তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ নিয়ে আলোচনা করে। তাদের সাধারণ থেকে অসাধারণ, সবার আলোচনা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অথচ তাগুতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাগুতের বিরোধিতা করা ব্যতিরেকে কারও ইমানই পরিশুদ্ধ হয় না, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয় না। এমন ইমানি মেহনত যুগের পর যুগ করেও কতটুকু লাভ, তা আল্লাহই ভালো জানেন। এ কারণেই পৃথিবীতে ইমানে মেহনতের সাথি ঠিকই বাড়ছে, কিন্তু মুসলমানদের ভাগ্যে আর পরিবর্তন আসছে না। আর আসবেই বা কীভাবে! রাসুলুল্লাহ ﷺ তো সুসংবাদ শুনিয়ে গেছেন এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে নয়; বরং গুরাবাদের। ফা-তুবা লিল-গুরাবা। সুতরাং এই ফিতনার যুগে যারা সত্যের ওপর দৃঢ়পদ থাকে, সত্য প্রতিষ্ঠায় নিজেদের সরব রাখে, তারাই হলো গুরাবা। আর তাদেরই সুসংবাদ শুনিয়ে গেছেন মহান রাসুল ﷺ।

শহিদ সায়্যিদ কুতুব রহ. বলেন :

'আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের একটি হলো হাকিমিয়্যাহ। যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য আইন প্রণয়ন করে, তখনই সে নিজেকে আল্লাহর বদলে এমন আরেক প্রভুর ভূমিকাতে বসিয়ে

নেয়, যার আইনের আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয়। আর যারা এই এক আইনপ্রণেতা বা অনেকজন আইনপ্রণেতার আনুগত্য করে, তারা আল্লাহর গোলামের পরিবর্তে আইনপ্রণেতাদের গোলামে পরিণত হয়। তারা অনুসরণ করে আইনপ্রণেতাদের রচিত দীনের; আল্লাহ তাআলার মনোনীত দীন ইসলামের নয়। জেনে রাখুন আমার ভাইয়েরা, এটা আকিদা ক্ষেত্রে সবচে বড় বিপর্যয়। এটা হলো ইবাদত ও দাসত্বের প্রশ্ন। এটা হলো ইমান ও কুফরের প্রশ্ন। জাহিলিয়্যাত ও ইসলামের পশ্ন। জাহিলিয়্যাত কোনো নির্দিষ্ট সময় বা যুগ নয়; জাহিলিয়্যাত হলো একটি অবস্থা।'[২৮]

ইবাদতের পরিচয় কী? এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রহ. বলেন :

'ইবাদত শব্দের মূল অর্থ হলো আনুগত্য। কোনো পথযখন পথচারীদের অধিক চলাফেরায় মথিত হয়ে যায়, আরবিতে তখন সেই পথকে طَرِيْقٌ مُعَبَّدٌ বলা হয়।

তবে শরিয়ত নির্দেশিত ইবাদতের মধ্যে বিনয়ের পাশাপাশি ভালোবাসার অর্থও রয়েছে। সুতরাং শরিয়তের পরিভাষায় ইবাদত বলতে আল্লাহ তাআলার প্রতি চূড়ান্ত ভালোবাসার ভিত্তিতে তার সামনে চূড়ান্তভাবে বিনয়ী হওয়াকে বোঝায়।

এ জন্য আল্লাহ তাআলার ইবাদতে ভালোবাসা এবং আনুগত্য—এ দুটোর কোনো একটির অস্তিত্ব যথেষ্ট হয় না। বরং আনুগত্যের পাশাপাশি অপরিহার্য হলো, মহান আল্লাহ বান্দার কাছে সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে, তিনি তার কাছে সকল কিছু থেকে অধিক মর্যাদাবান হবে। আর বাস্তবতা তো হলো, পরিপূর্ণ বিনয় এবং চূড়ান্ত ভালোবাসার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তাআলাই।'[২৯]

---

[২৮] *তাফসির ফি জিলালিল কুরআন*, শহিদ সায়্যিদ কুতুব রহ.।
[২৯] *আল-উবুদিয়্যাহ*, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রহ.।

তিনিই একমাত্র ইলাহ

১২. সুতরাং তিনি ছাড়া আর কেউই ইবাদতের উপযুক্ত নয়। আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মান প্রদানকে ইবাদত বলা হয়।

<u>ব্যাখ্যা :</u> ইবাদত অর্থ সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মান প্রদান। একইভাবে ইবাদত শব্দের মূল অর্থ হলো আনুগত্য। আরবিতে কোনো পথকে طَرِيْقٌ مُعَبَّدٌ বলা হয়, যখন তা হয় পদানত এবং পথচারীদের অধিক চলাফেরায় মথিত।

তবে শরিয়ত নির্দেশিত ইবাদতের মধ্যে বিনয়ের পাশাপাশি ভালোবাসার অর্থও রয়েছে। সুতরাং শরিয়তের পরিভাষায় ইবাদত বলতে আল্লাহ তাআলার প্রতি চূড়ান্ত ভালোবাসার ভিত্তিতে তার সামনে চূড়ান্তভাবে বিনয়ী হওয়াকে বোঝায়।

সুতরাং আল্লাহর ইবাদত করার অর্থ হলো তার দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে দ্বিধাহীন চিত্তে সর্বান্তকরণে মেনে নেওয়া। পক্ষান্তরে গাইরুল্লাহর ইবাদত করার অর্থ হলো গাইরুল্লাহর সামনে অবনত হওয়া। গাইরুল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে তা কোনো পাথুরে মূর্তি হওয়া জরুরি নয়; বরং বান্দা আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর সামনে চূড়ান্তভাবে অবনত হয় এবং তাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মান প্রদর্শন করে, তা-ই তার উপাস্য; চাই তা হোক দেশ, জাতি, নেতা, পীর কিংবা অন্য কিছু। সুতরাং গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, জাতীয়তাবাদী কিংবা পির ও মাজারপূজারীরা কিছুতেই আল্লাহর ইবাদতকারী নয়।

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا

يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ.

আদি ইবনে হাতিম রা. বলেন, আমি আসলাম। আমি গলায় স্বর্ণের ক্রুশ পরে নবিজি ﷺ-এর সামনে এলাম। তিনি বললেন, হে আদি, তোমার গলা হতে এই প্রতীমা সরিয়ে ফেলো। আর আমি তাঁকে সুরা বারাআতের এই আয়াত পাঠ করতে শুনলাম—(অনুবাদ) : 'তারা আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।'[৩০] তারপর তিনি বললেন, তারা সরাসরি তাদের পূজা করত না। তবে এ সকল ধর্মীয় পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীরা কোনো জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত, তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিত। আবার তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত, তখন নিজেদের জন্য সেটাকে হারাম বলে মেনে নিত।[৩১]

সুতরাং আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে অন্য কারও বিধিবিধান মেনে নেওয়াই তার ইবাদত করার নামান্তর। ইবাদত শব্দটির মধ্যে ব্যাপকতা রয়েছে। নামাজ-রোজা ইত্যাদির সঙ্গেই কেবল সীমাবদ্ধ নয়। যে যার বিধিবিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করে, সে তার দাসে পরিণত হয়।[৩২] আজ যারা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে অকুণ্ঠচিত্তে তাগুতের বিধিবিধান মেনে নিচ্ছে, তারা সবাই-ই শিরকে লিপ্ত। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাগুতকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে।

---

[৩০] সুরা তাওবা : ৩১।

[৩১] *সুনানুত তিরমিজি* : ৩০৯৫।

[৩২] এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন—আমার অনূদিত *দাসত্বের মহিমা*।

সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ তাঁরই কর্তৃত্বে

১৩. তিনি ছাড়া আর কেউ কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য দেয় না, কাউকে কোনো জীবিকা প্রদান করে না এবং কারও কোনো কষ্ট-মুসিবত দূর করে না। (একমাত্র তিনিই সবকিছু করেন। আর তা এভাবে যে,) তিনি যখন কোনো কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন কোনো বাহ্যিক উপকরণ গ্রহণ করা ব্যতিরেকেই বলে দেন, হয়ে যাও। ফলে তা হয়ে যায়। (তার সবকিছু সম্পন্ন করার পন্থা তা নয়, যা) স্বাভাবিক বাহ্যিক উপকরণের দ্বারা সংঘটিত এবং বাহ্যিক উপকরণের অধীনে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন : 'মানুষ বলে, চিকিৎসক রোগীকে সুস্থ করেছে' (অর্থাৎ বাহ্যিক উপকরণের অধীনে তার চিকিৎসা করেছে এবং তাকে পথ্য দিয়েছে)। 'শাসক সেনাবাহিনীকে জীবিকা দিয়েছে' (অর্থাৎ তাদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি দিয়েছে)।তো বাহ্যত শব্দের মিল থাকলেও এগুলোর অর্থ ভিন্ন। (সুতরাং মানুষের দিকে সম্পৃক্ত করা হলে এসব বাক্যের যে অর্থ হয়, আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে সে অর্থ ধর্তব্য নয়।)

ব্যাখ্যা : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. বলেন, 'নিখিল বিশ্ব অস্তিত্বহীনতার অতল গহ্বরে লুকায়িত ছিল। 'হয়ে যায়' শব্দ দ্বারা আল্লাহ তাআলা সবকিছুর অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই সৃষ্টি এমন একটি কাজ, যা কোনো উপাদান ছাড়াই আল্লাহ তাআলার কুদরতে হয়েছে। অস্তিত্বহীনতার মধ্য থেকে যাবতীয় সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বের মহিমায় সুবিন্যস্ত করেছেন। সারা বিশ্ব প্রথমে অস্তিত্বহীন পর্দার অন্তরালে ছিল। একমাত্র 'হয়ে যাও' শব্দ দ্বারা সবকিছু অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া মহান আল্লাহ তাআলার এমন এক কর্মপন্থা, যা জড় উপাদান ছাড়া কেবল তার কুদরতের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। কারণ, অস্তিত্বকে অস্তিত্বহীনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটালে কেবলমাত্র আপতন ছাড়া চিরন্তন কিছুই নির্গত হবে না।'

তাঁর কোনো সহযোগী নেই

১৪. আল্লাহ তাআলার কোনো সহযোগী নেই।

ব্যাখ্যা : সুতরাং ফেরেশতারা আল্লাহর সহযোগী নয়। আল্লাহ তাআলা বিশেষ হিকমাতের কারণে সৃষ্টিকুলের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের নিয়োজিত রেখেছেন। কিন্তু তিনি তাদের দিকে মুখাপেক্ষী নন। বরং তিনি তো মহাশক্তির আধার। তিনি যা চান, তা-ই তিনি করতে পারেন।

তিনি অবতারিত হন না

১৫. তিনি কোনো জিনিসের মধ্যে অবতারিত হন না।

ব্যাখ্যা : হুলুল (অবতারিত হওয়া) মূলত হিন্দুয়ানি আকিদা। হুলুল হলো আল্লাহর সত্তা অন্য কারও সত্তার মধ্যে অবতারিত হওয়া কিংবা অন্য কোনো সত্তা আল্লাহর সত্তার মধ্যে অবতারিত হয়ে যাওয়া। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, প্রভু মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষ, পাথরসহ সবকিছুর মধ্যে অবতারিত হন। শাইখ আবদুল হক হক্কানি রহ. বলেন, যেসব মূর্খ লোকেরা বলে, আল্লাহর খাস ওলিগণ আল্লাহর সত্তার মধ্যে এমনভাবে লীন হয়ে যান, যেমন বরফ পানির মধ্যে এবং বিন্দু সমুদ্রের মধ্যে লীন হয়ে যায়, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং স্পষ্ট কুফর। (আকায়িদুল ইসলাম) যারা বলে বেড়ায়, আল্লাহ সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান, তারা মূলত জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে এ বিভ্রান্তিতেই পতিত। হ্যাঁ, আল্লাহ জ্ঞানগতভাবে এবং দর্শন ও শ্রবণগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তিনি একীভূত হয়ে যান না

১৬. তিনি অন্য কোনো জিনিসের সঙ্গে একীভূত হয়ে যান না।

ব্যাখ্যা : ইত্তেহাদ শব্দের অর্থ হলো এক হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ দুটো ভিন্ন হাকিকতের জিনিস একটির সঙ্গে অন্যটি দ্রবীভূত ও মিশ্রিত হয়ে এক সত্তায়

পরিণত হওয়া। হুলুলের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো, হুলুলের মধ্যে দুটো সত্তাকে সাব্যস্ত করা হয়। পক্ষান্তরে ইত্তিহাদের মধ্যে দুটোকে মিলিয়ে সেরেফ একটি সত্তাকেই সাব্যস্ত করা হয়। আর হুলুল আলাদা হওয়াকে গ্রহণ করে, পক্ষান্তরে ইত্তিহাদ ভিন্ন ভিন্ন সত্তাকে অভিন্ন সত্তায় পরিণত করে রাখে, যা আর কখনো আলাদা হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ : খ্রিষ্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ তারা প্রভু, যিশু এবং পবিত্র আত্মা—এই তিনও সত্তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, প্রভু এই তিন সত্তার মধ্যে দ্রবীভূত ও মিশ্রিত হয়ে গেছেন। সুতরাং যিশু এবং পবিত্র আত্মার সঙ্গে প্রভুর ইত্তিহাদ হয়েছে।

মহান আল্লাহ তাআলা সকল ত্রুটি ও বিচ্যুতি, সৃষ্ট ও সম্ভাব্যতার সকল নিদর্শন থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি শরীর ও শারীরিক এবং স্থান ও কালের গণ্ডি থেকে পবিত্র। স্বমূর্ততা ও শারীরিক অবয়বের বৈশিষ্ট্য ও বাধ্যবাধকতা থেকে তিনি পবিত্র। তাঁর নিকট স্থান-কাল ও দিক ইত্যাদি কোনো কিছুরই কার্কারিতা নেই। সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি।

আল্লাহ তাআলা কোনো বস্তুর সঙ্গেই একীভূত হন না এবং কোনো বস্তু তাঁর সঙ্গে একীভূত হয় না। কোনো বস্তু তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না এবং তিনিও কোনো বস্তুতে প্রবিষ্ট হন না। হিন্দুদের মতে, আল্লাহ তাআলা মানুষ, জীবজন্তু, গাছ ও পাথরের মধ্যে প্রবেশ করে থাকেন। সামিরির (মুসা আ.-এর সময়ের মূর্তিনির্মাতা) বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ বাছুরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় প্রবেশ করে এসেছিলেন। হিন্দুস্তানের মূর্তি নির্মাতার দল গরু পূজায় মিশরের সামিরির অনুসারী। হিন্দুধর্মের অস্পৃশ্যতার মতবাদও সামিরির স্পর্শ মতবাদ থেকে উৎসারিত। সামিরি যাকেই দেখত, তাকেই বলত, 'আমাকে স্পর্শ করো না'। অনুরূপ হিন্দুরাও কোনো মুসলমানকে দেখে বলে, 'আমাকে স্পর্শ করো না'। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের গরু পূজা ও অস্পৃশ্যতার রীতির সঙ্গে সামিরির কার্যাবলির মিল রয়েছে।

ইমাম রাজি রহ. সামিরির আলোচনায় বলেন, 'সামিরি হালুলিয়া দলের অনুসারী ছিল। হালুলিরা মনে করত যে, আল্লাহ তাআলা কোনো শারীরিক অবয়বে প্রবেশ করতে পারেন।'

তিনি অবিনশ্বর

১৭. তার সত্তায় অনিত্য[৩৩] কিছু বিরাজ করে না। তার সত্তা এবং গুণাবলির মধ্যে কোনো অনিত্যত্ব নেই।

ব্যাখ্যা : সুতরাং সকলকেই এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর সকল গুণ চিরন্তন। কারণ, আপতন কোনো গুণ আল্লাহর সত্তায় বিরাজ করে না। তিনি যদি এই বিশ্ব সৃষ্টি না করতেন, তবুও তার মধ্যে যে সৃষ্টি করার শক্তি ও সামর্থ্য আছে, তা বিশ্বাস করতে হবে। এ জন্য তার 'স্রষ্টা' নাম চিরন্তন। তার 'স্রষ্টা' নাম সৃষ্টিজগতের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং জগতের সৃষ্টি হওয়া তার সৃষ্টি করার ওপর নির্ভরশীল। তার মধ্যে যদি সৃষ্টি করার চিরন্তন গুণ না থাকত, তাহলে এই জগত কীভাবে সৃষ্টি হতো?

১৮. হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলার অনিত্য গুণাবলি যখন তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন কেবল তার মধ্যে অনিত্যত্ব থাকে; যাতে করে কর্ম প্রকাশিত হয়। আদতে আল্লাহ তাআলার গুণাবলির সম্পর্কযুক্ত হওয়াও অনিত্য নয়; বরং অনিত্য শুধু সেই সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো। (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুই অনিত্য ও নশ্বর। আল্লাহ তাআলা নিজে যেমন অবিনশ্বর, তার গুণাবলিও অবিনশ্বর এবং এ সকল গুণ অন্য কিছুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিষয়টিও অবিনশ্বর।) এ জন্য এই সম্পর্কযুক্ত হওয়ার বিধানও বিভিন্ন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়। বাস্তবতা তো হলো, আল্লাহ তাআলার সত্তা এবং গুণাবলির মধ্যে কোনো ধরনের অনিত্যত্ব নেই। মহান আল্লাহ সর্বপ্রকার অনিত্যত্ব এবং নশ্বরতা থেকে মুক্ত।

ব্যাখ্যা : সুতরাং আল্লাহ তাআলার সকল গুণ অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান, যেমনিভাবে তাঁর সত্তা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। অনাদি সত্তার গুণ অনাদিই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলার গুণাবলিকে অনিত্য বললে এ কথাও

[৩৩] চিরন্তন-এর বিপরীত, নশ্বর

বলতে হবে যে, তা পরিবর্তনকে গ্রহণ করে। কারণ, অনিত্য বিষয়ের মধ্যে পরিবর্তন এসে থাকে। কিংবা এ কথা বলতে হবে যে, এক সময় এমন অতিবাহিত হয়েছে, যখন আল্লাহ তাআলার সত্তায় এসব গুণের অস্তিত্ব ছিল না। কারণ, অনিত্য বিষয়গুলোই এমন, যা এক সময় অস্তিত্বহীন ছিল। অথচ আল্লাহ তাআলা অনাদিকাল থেকেই তাঁর সমস্ত গুণের দ্বারা গুণান্বিত। সুতরাং যারা বলে, আল্লাহ তাআলা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পর আরশে সমুন্নত হয়েছেন, তারা কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থের আলোকে তা বলে থাকলেও কথাটি নিরেট ভুল। কারণ, আরশ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। আর আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই অনিত্ব এবং নশ্বর। সুতরাং একটা সময় এমন ছিল, যখন আরশ ছিল না। আল্লাহ তাআলার সকল গুণ যেহেতু অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান, সুতরাং আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন, এখনো তিনি তেমনই রয়েছেন। সুতরাং 'আল্লাহ আরশে সমুন্নত হয়েছেন' কথাটি সঠিক নয়। এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, তাহলে আয়াতের অর্থ কী করা হবে? আমরা বলব, আয়াতের অর্থ করা হবে, 'আল্লাহ তাআলা আরশে ইসতিওয়া গ্রহণ করেছেন'। আর স্পষ্ট যে, ইসতিওয়ার অর্থ আমরা জানি না। সুতরাং আমরা আল্লাহ তাআলার আয়াতের প্রতি ইমান রাখি ঠিক সে অর্থের ওপর, যা আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনিই সম্যক অবগত।

এ ছাড়াও আল্লাহ তাআলার গুনাবলিকে নশ্বর ও অনিত্য বললে আল্লাহ তাআলার সত্তাকে অনিত্য বিষয়ের আধার বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর তা অসম্ভব।

সুতরাং আল্লাহ তাআলার প্রতিটি সিফাতি নাম অনাদি। যেমন, সৃষ্টি করা তাঁর একটি গুণ। সৃষ্টিজীব না থাকলেও তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করার গুণ অবশ্যই ছিল। অতএব তাঁর সৃষ্টিকর্তা নামটি অনাদি। এমনিভাবে তাঁর সমস্ত গুণের ক্ষেত্রেই এরূপ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য।

আল্লাহ তাআলার গুণাবলি যেমন অনাদি, তেমনি অনন্ত। কারণ, যেটা অনাদি হয়, সেটা অনন্তও হয়। একইভাবে আল্লাহ তাআলার গুণাবলির মধ্যে কোনো পর্যায়ক্রমিকতা নেই। এরূপ বলা সংগত নয় যে, তাঁর অমুক গুণে আগের এবং অমুক গুণ পরের। কারণ, তাঁর সমস্ত গুণ অনাদি ও নিত্য। আর

পর্যায়ক্রমিকতা সাব্যস্ত করলে পরবর্তীটা অনাদি ও নিত্য থাকে না; বরং পূর্বের তুলনায় পরবর্তীটা অনিত্য হয়ে যায়।

তিনি উপাদান-গঠিত, দেহবিশিষ্ট কিংবা দেহের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন

১৯. আল্লাহ তাআলা কোনো উপাদান-গঠিত নন এবং তিনি কোনো দেহের সঙ্গে সম্পৃক্তও নন।আর না তিনি দেহবিশিষ্ট সত্তা।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা কোনো উপাদান-গঠিত বস্তু নন। যার ফলে তিনি কোনো সময় বা স্থানে প্রতিষ্ঠিত নন। কারণ, তিনি যদি অন্য কোনো উপাদন-গঠিত বস্তু হতেন, তাহলে সেই মৌলিক উপাদানের প্রতি তার মুখাপেক্ষিতা অবধারিত হয়ে যেত। অথচ আল্লাহ কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহ তাআলা কোনো দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নন। কারণ, তিনি কোনো দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলে তাঁর সত্তা অনিত্য হওয়া অবিধারিত হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তাআলার সত্তা নিত্য, অবিনশ্বর ও চিরন্তন। তিনি অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। তদুপরি তিনি কোনো দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলে তাঁর সত্তা সেই দেহের মুখাপেক্ষী প্রমাণিত হবে। অথচ আল্লাহ তাআলা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন।

আর না তিনি দেহবিশিষ্ট সত্তা। কারণ, দেহ একাধিক অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। আর আল্লাহর জন্য দেহ স্বীকার করলে তাঁর একাধিক অংশ স্বীকার করতে হয়। অথচ একাধিক অংশের ক্ষেত্রে এক অংশ অপর অংশের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুখাপেক্ষিতা থেকে পবিত্র।

তিনি স্থান ও কালের বন্ধন থেকে মুক্ত

২০. আল্লাহ তাআলা কোনো জায়গা বা কোনো দিকে অবস্থিত নন। আর না তার দিকে 'এখানে' বা 'সেখানে' শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা যায়।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা নিজ সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি কোনো নির্দিষ্ট দিক বা স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সমাহিত কিংবা গণ্ডিবদ্ধ নন। তিনি স্থান ও কালের গণ্ডি থেকে মুক্ত। কারণ, স্থান প্রয়োজন দেহবিশিষ্ট বস্তুর জন্য। আর আল্লাহ তাআলা দেহ থেকে পবিত্র। তাঁর কোনো স্থান নেই। না তিনি আকাশে আর না তিনি ভূমিতে। না তিনি আরশের ওপর সমাসীন আর না তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সমগ্র জগত তাঁর সামনে একটি অনু পরিমাণ বস্তুর সমতুল্য। তিনি কীভাবে এর মধ্যে সমাহিত হতে পারেন? হ্যাঁ, তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন। কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে নয়।

আল্লাহ তাআলার সত্তা ডান-বাম, ওপর-নিচ, সম্মুখ-পশ্চাৎ ইত্যাদি সকল দিক থেকে মুক্ত। কেননা, এতে করে আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ হওয়া অবধারিত হয়ে যায়। তদুপরি এতে করে আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দেহ সাব্যস্ত হয়ে যায়। কারণ, কোনো দিকে বা স্থানে থাকা দেহের বৈশিষ্ট্য।

তাঁর সত্তা ও গুণসমূহ অপরিবর্তনীয়

২১. আল্লাহ তাআলার জন্য সংগত নয় যে, তাঁর সত্তা কিংবা গুণাবলির ক্ষেত্রে কোনোনড়াচড়া,স্থানান্তর কিংবা পরিবর্তন ঘটবে।

ব্যাখ্যা : সুতরাং যারা বলে, আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তাআলা আরশে অধিষ্ঠিত কিংবা সমাসীন হয়েছেন, তাদের এ কথা নিরেট গলদ। কারণ, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার গুণের ক্ষেত্রে নড়াচড়া, স্থানান্তর এবং পরিবর্তন সাব্যস্ত করা হয়। একইভাবে যারা বলে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, তারাও ভ্রান্তিতে নিপতিত। কারণ, তারা আল্লাহর জন্য বিস্তৃত স্থান সাব্যস্ত করেছে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, তাহলে আল্লাহ কোথায়? আমরা ইমামগণের বক্তব্যের আলোকে তার প্রশ্নের উত্তর দেবো।

১. ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহ কোথায়? তিনি বললেন :

كان الله تعالى ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء

যখন কোনো স্থানই ছিল না, তখনো আল্লাহ ছিলেন। সৃষ্টির অস্তিত্বের পূর্বে তিনি ছিলেন। তিনি তখনো ছিলেন, যখন 'কোথায়' বলার মতো জায়গা ছিল না, কোনো সৃষ্টি ছিল না এবং কোনো বস্তুই ছিল না। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা।[৩৪]

২. ইমাম আবু হানিফা রহ. আরও বলেন :

نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

আমরা স্বীকার করি যে, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন। তিনি আরশের প্রতি কোনো ধরনের প্রয়োজন ও তার ওপর স্থিতিগ্রহণ ব্যতিরেকেই তার ওপর ইসতিওয়া করেছেন। তিনি আরশ ও আরশ ছাড়া অন্য সব সৃষ্টির সংরক্ষণকারী কোনো ধরনের মুখাপেক্ষিতা ব্যতিরেকে। তিনি যদি মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে সৃষ্টিজীবের মতো মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন না। তিনি যদি আরশের ওপর সমাসীন হওয়া এবং স্থির হওয়ার দিকে মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? আল্লাহ এসব বিষয় থেকে সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে।[৩৫]

---

[৩৪] *আল-ফিকহুল আবসাত* : ৫৭

[৩৫] *আল-ওসিয়্যাহ* : ২

৩. ইমাম ইবনু আবদুস সালাম রহ. ইমাম আবু হানিফা থেকে উদ্ধৃত করেন :

من قال لا أعرف الله تعالى في السماء هو أم في الأرض كفر، لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه

যে ব্যক্তি বলবে, আমি জানি না, আল্লাহ তাআলা আকাশে আছেন নাকি পৃথিবীতে, সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, এই কথাটি এ সংশয় সৃষ্টি করে যে, আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো স্থান রয়েছে। যে ব্যক্তি এ ধারণা রাখবে যে, আল্লাহ জন্য কোনো স্থান রয়েছে, সে একজন মুশাব্বিহা।[৩৬]

৪. ইমাম মাতুরিদি রহ. লেখেন :

'আল্লাহ তাআলার অবস্থানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

(ক) তাদের কেউ কেউ ধারণা করছে যে, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর অধিষ্ঠিত। তাদের নিকট আরশ হলো একটি সিংহাসন; ফেরেশতাগণ যা বহন করে এবং এর চারদিক প্রদক্ষিণ করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, 'সেদিন আপনার প্রতিপালকের আরশকে আটজন ফেরেশতা বহন করবে।'[৩৭] 'আপনি ফেরেশতাদের আরশ প্রদক্ষিণ করতে দেখবেন।'[৩৮] অন্য আয়াতে রয়েছে, 'যে সকল ফেরেশতা আরশ বহন করে এবং আরশের চারপাশ প্রদক্ষিণ করে।'[৩৯]

এরা পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছে। পবিত্র কুরআনের সুরা তহার ৫ নম্বর আয়াতে রয়েছে, 'দয়াময় আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন।'

এ ছাড়াও তাদের দলিল হলো, মানুষ দুয়ার সময় ওপরের দিকে হাত উত্তোলন করে এবং ওপর থেকে নিজেদের কল্যাণের প্রত্যাশা করে। এদের

---

[৩৬] *শারহুল ফিকহিল আকবার*, মোল্লা আলি কারি

[৩৭] সুরা হাক্কা : ১৭

[৩৮] সুরা যুমার : ৭৫

[৩৯] সুরা মুমিন : ৭

বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলা পূর্বে আরশে ছিলেন না। পরবর্তীতে আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তারপর তিনি আরশে ইসতিওয়া করেছেন।'[৪০]

(খ) কেউ কেউ বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা সব জায়গায় রয়েছেন। এরা পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত দ্বারা দলিল দিয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি যদি কথোপকথন করে, তবে আল্লাহ তাআলা হন চতুর্থজন।'[৪১] অপর আয়াতে রয়েছে, 'আমি তাদের ঘাড়ের রগের চাইতেও অধিক নিকটবর্তী।'[৪২] অন্য আয়াতে রয়েছে, 'আমি তোমাদের চেয়ে মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী। অথচ তোমরা দেখো না।'[৪৩] অন্য আয়াতে তিনি বলেন, 'অথচ তিনি সেই আল্লাহ, যিনি আকাশেও প্রভু এবং পৃথিবীতেও প্রভু।'[৪৪]

এরা ধারণা করেছে যে, যদি আল্লাহ তাআলাকে সব জায়গায় বিরাজমান না বলা হয়, তাহলে এর দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে সীমিত করা হয়। প্রত্যেক সীমিত জিনিস তারচে বড় জিনিস থেকে ছোট। এটি আল্লাহর জন্য একটি ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত।

এদের এই অসার বক্তব্যে আল্লাহ তাআলাকে স্থানের মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহর জন্য সীমা সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, কোনো কিছু যদি বাস্তবে কোনো স্থানে অবস্থান করে, তাহলে উক্ত বস্তুটির ওই স্থান থেকে বড় হওয়াটা সম্ভব নয়। কেননা, এটা যদি স্থান থেকে বড় হয়, তাহলে উক্ত স্থানে তার অবস্থান সম্ভব নয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে থাকবে, অথচ সে স্থান থেকে বড় হবে, এটি একটি হাস্যকর বিষয়। সুতরাং যারা আল্লাহ তাআলাকে সর্বত্র বিরাজমান বলেন, তারাও আল্লাহ তাআলাকে সব জায়গার মধ্যে সীমিত করে দিয়েছেন। এদের বক্তব্য অনুযায়ী মহাবিশ্বের সীমা ও

[৪০] সুরা আরাফ : ৫৪
[৪১] সুরা মুজাদালা : ৭
[৪২] সুরা কাফ : ১৬
[৪৩] সুরা ওয়াকিআ : ৮৫
[৪৪] সুরা জুখরুফ : ৮৪

আল্লাহর সীমা একই হওয়া আবশ্যক হয়। আর মহান আল্লাহ তাআলা এগুলো থেকে সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে।

(গ) তৃতীয় দলের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলা সকল স্থান ও জায়গা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। রূপক অর্থে কখনো কোনো স্থানের দিকে আল্লাহ তাআলাকে সম্পৃক্ত করলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা উক্ত স্থানের সংরক্ষণ ও লালন-পালনকারী।'[৪৫]

৫. ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ. আরও লেখেন :

'আল্লাহ তাআলার অবস্থানের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মূলনীতি হলো, যখন কোনো স্থান ছিল না, তখনো আল্লাহ তাআলা ছিলেন। কোনো জায়গার অস্তিত্ব না থাকলেও আল্লাহর অস্তিত্ব সম্ভব। আল্লাহ তাআলা অনাদি থেকে বিদ্যমান রয়েছেন। যেমন কোনো স্থানের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও তিনি অবিনশ্বর রয়েছেন। মহান আল্লাহর সত্তা বা গুণাবলি পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন, হ্রাস-বৃদ্ধি ও বিলুপ্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।'[৪৬]

৬. ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দি রহ. বলেন :

'আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে কিছু লোক মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। কাররামিয়া ও মুশাব্বিহাদের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলা স্থানগতভাবে আরশের ওপর রয়েছেন। তাদের নিকট নশ্বর আরশ হলো আল্লাহর অবস্থান বা অধিষ্ঠানের জায়গা। তারা স্থানের দিক থেকে আল্লাহ তাআলার জন্য এখান থেকে অবতরণ, চলাফেরা ইত্যাদি সাব্যস্ত করেছে। তারা বলে, আল্লাহ তাআলা দেহবিশিষ্ট। তবে তিনি অন্যান্য দেহবিশিষ্টদের মতো নন। মহান আল্লাহ তাদের এসব ভ্রান্ত আকিদা থেকে সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে। তারা তাদের মতবাদ প্রমাণে কুরআনের সুরা তহার ৫ নম্বর আয়াত ব্যবহার করে। তাতে রয়েছে, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন।

[৪৫] *কিতাবুত তাওহিদ*: ১৩১
[৪৬] *কিতাবুত তাওহিদ*: ১৩২

আমরা তাদের এই মতবাদ এভাবে খণ্ডন করি, আরশ এক সময় ছিল না। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মাধ্যমে তা অস্তিত্ব লাভ করেছে। এখন নশ্বর আরশের ওপর হয়তো আল্লাহ তাআলা নিজের ক্ষমতা, বড়ত্ব ও কর্তৃত্ব প্রকাশ করবেন অথবা নিজের বসার প্রয়োজনে সেখানে আসন গ্রহণ করবেন। অকাট্যভাবে প্রমাণিত সত্য হলো, অন্যের মুখাপেক্ষী কেউ কখনো স্রষ্টা হতে পারে না। সে তো নিজের প্রয়োজনেই অন্যের দ্বারস্থ। সে কীভাবে অন্যের ওপর ক্ষমতাবান হবে? অন্যের দ্বারস্থ ব্যক্তি তো নেতা হওয়ারই যোগ্য নয়। সে কীভাবে প্রতিপালক হবে? আরশে বসা বা এর ওপর অবস্থান গ্রহণের সম্ভাবনা যখন ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো, তখন প্রথম সম্ভাবনাই সঠিক। অর্থাৎ আরশ আল্লাহর সৃষ্টি হওয়ার কারণে তা আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সামনে তুচ্ছ। এর প্রতি কোনোরূপ প্রয়োজন ব্যতীত আল্লাহ তাআলা নিজের কর্তৃত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করেছেন।'[৪৭]

৭. তিনি আরও বলেন :

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, আল্লাহ তাআলা নিজের মহত্ব, বড়ত্ব ও প্রভুত্বের দিক থেকে আরশের ওপর সমুন্নত। স্থান, দূরত্ব ও উচ্চতার দিক থেকে তিনি আরশের ওপর সমুন্নত নন; যেমনটি ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন। তিনি আল্লাহর মর্যাদাগত সমুন্নত হওয়ার কথা বলেছেন। কেননা, মর্যাদা ও বড়ত্বের দিক থেকে সমুন্নত হওয়াটা মহান প্রতিপালকের গুণ।'[৪৮]

৮. ইমাম আবুল ইয়াসার বাজদাবি রহ. লেখেন :

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা-বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তাআলা স্থান থেকে মুক্ত। তিনি আরশে বা অন্য কোনো স্থানে নন। তিনি আরশের ওপরও নন। আল্লাহ তাআলা সমস্ত দিক থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত। ভ্রান্ত আকিদায় নিপতিত কিছু হাম্বলি, কাররামিয়া, ইহুদি ও মুজাসসিমার আকিদা হলো, আল্লাহ তাআলা আরশে অবস্থান করেন বা অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন। তাদের

[৪৭] *শারহুল ফিকহিল আবসাত*: ২৫-২৬
[৪৮] প্রাগুক্ত

কেউ কেউ বলে, অন্যান্য দেহবিশিষ্ট বস্তুর মতো আল্লাহ তাআলার ছয় দিক রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলে, আল্লাহ তাআলার একটি দিক রয়েছে (ওপরের দিক)। আর এই দিকের কারণে তিনি আরশে অবস্থান গ্রহণ করেছেন।[৪৯]

৯. ইমাম গাজালি রহ. বলেন :

তুমি জাহাম ইবনু সাফওয়ানের আকিদাগত ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থেকো। কিছু লোকের ভ্রান্ত বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তাআলা সব জায়গায় রয়েছেন। যারা আল্লাহ তাআলাকে কোনো জায়গা অথবা দিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে, তাদের পদস্খলন হয়েছে। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা তাদের সমস্ত চিন্তাভাবনাকে জীব-জন্তুর ইন্দ্রীয় ক্ষমতার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে। তাদের চিন্তাশক্তি দেহ ও দেহ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গণ্ডি থেকেও মুক্ত হয়নি।[৫০]

এবার আমরা হানাফি মাজহাবের প্রখ্যাত ইমামগণের থেকে এ বিষয়ক আকিদা উদ্ধৃত করব :

[৪৯] *উসুলুদ দীন*: ৪০
[৫০] *আল-আরবাইন ফি উসুলিদ দীন*: ১৯৮
আরও দেখুন—*উসুলুস সারাখসি*, শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি : ১/১৮৫; *আল-মাবসুত*, শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি : ৪/৭; *আল-বিদায়াহ মিনাল কিফায়াহ ফিল হিদায়াহ ফি উসুলিদ দীন*, ইমাম নুরুদ্দীন আহমাদ ইবনু মাহমুদ আস-সাবুনি : ৪৪-৪৫; *মুশকিলুল হাদিস*, ইমাম ইবনু ফুরাক : ৬৫; *আল-ই'তিকাদ ওয়াল হিদায়াহ ইলা সাবিলির রাশাদ*, ইমাম বায়হাকি : ৭০; *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ৩/৭; *শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা*, আল্লামা সা'দ তাফতাজানি : ১৩২; *তাবসিরাতুল আদিল্লাহ*, ইমাম আবুল মুইন নাসাফি : ১/৩২৫-৩২৬; *শারহু মাতনিল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা*, কাজি শাইবানি : ৪৪; *আল-হাদি ফি উসুলিদ দীন*, ইমাম খুজান্দি : ৪৭; *শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা*, আল্লামা আবদুল গনি মাইদানি : ৭৫; *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার আসকালানি : ১/৫০৮; *আল-ইওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির*, ইমাম শা'রানি : ১/৬৫; *শারহুল ফিকহিল আকবার*, মোল্লা আলি কারি : ৫৭; *আল-মুসামারা শারহুল মুসায়ারা লিল ইমাম ইবনিল হুমাম*, আল্লামা কামালুদ্দীন মাকদিসি : ৩০; *আল-ই'তিমাদ ফিল ই'তিকাদ*, ইমাম আবুল বারাকাত নাসাফি : ১৬৯; *আল-হাদিয়্যাতুল আলাবিয়্যা*, আল্লামা আলাউদ্দীন হানাফি : ৪২৬।

১০. ইমাম বদরুদ্দীন আইনি রহ. বলেন :

'আবুল আলিয়া বলেছেন, (আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে) ইসতাওয়া'র অর্থ হলো উঁচু হওয়া। তার এই ব্যাখ্যায় ত্রুটি রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা কখনো নিজের সম্পর্কে ইরতাফাআ বা উঁচু হওয়ার গুণ ব্যবহার করেননি। মুজাসসিমাদের (দেহবাদী) বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর স্থির হয়েছেন বা স্থিতি গ্রহণ করেছেন। তাদের এই বক্তব্যটি ভ্রান্ত। কেননা, স্থির হওয়া বা স্থিতি গ্রহণ করা নশ্বর দেহের বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা কোনো কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া ও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হয়। আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে এগুলো অবাস্তব ও অকল্পনীয়।'[৫১]

১১. আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. বলেন :

'আল্লাহর জন্য স্থান সাব্যস্তের কারণে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, আল্লাহ তাআলা আকাশে রয়েছেন, এটা যদি সে হাদিসের বাহ্যিক বক্তব্য উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্যে বলে, তবে সে কাফির হবে না। কিন্তু বাস্তবে যদি আল্লাহ তাআলা আকাশে রয়েছেন—এ ধরনের বিশ্বাস রাখে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। এ বক্তব্য দ্বারা যদি তার বিশেষ কোনো নিয়ত না থাকে, তবুও অধিকাংশের নিকট এটা কুফরি হবে। এটাই সঠিক এবং এর ওপরই ফাতওয়া।'[৫২]

হুবহু একই ফাতওয়া মাসআলা হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত ফাতওয়াগ্রন্থ ফাতওয়া আলমগিরিতেও বিবৃত রয়েছে।[৫৩]

১২. উলামায়ে দেওবন্দের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব বিখ্যাত তাফসির ও হাদিস-বিশারদ আল্লামা আবদুল হক দেহলবি রহ. লেখেন :

'আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও অবস্থানের জন্য কোনো স্থানের প্রয়োজন নেই। কেননা, দেহবিশিষ্ট ও স্থানিক বস্তুর জন্যই কেবল অবস্থানের জায়গার প্রয়োজন হয়। মহান আল্লাহ তাআলা দেহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

---

[৫১] *উমদাতুল কারি* : ২৫/১১১
[৫২] *আল-বাহরুর রায়িক* : ৫/১২৯
[৫৩] *ফাতওয়া আলমগিরি* : ২/২৫৯

সুতরাং তিনি আকাশে থাকেন না। তিনি জমিনেও অবস্থান করেন না। পূর্ব-পশ্চিম কোথাও তিনি থাকেন না। বরং সমগ্র মহাবিশ্ব তাঁর নিকটি অণু-পরমাণুতুল্য। সুতরাং তিনি এই ক্ষুদ্র সৃষ্টির মধ্যে কেন অবস্থান করবেন? তবে সৃষ্টির সবকিছুই আল্লাহর সামনে পূর্ণ উদ্ভাসিত। কোনো কিছুই তাঁর থেকে সুপ্ত বা অজ্ঞাত নয়। সকল স্থান ও জায়গা আল্লাহর নিকট সমান।'[৫৪]

তিনি অজ্ঞতা ও মিথ্যার বিশেষণ থেকে পবিত্র

২২. আল্লাহ তাআলার সত্তা থেকে কখনো অজ্ঞতা বা মিথ্যা প্রকাশিত হওয়াও সম্ভব নয়।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার রয়েছে সার্বিক জ্ঞান। আকাশ ও পৃথিবীর কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও তাঁর জ্ঞানের পরিসীমার বাইরে নয়। যেহেতু তিনি সকল বস্তুর স্রষ্টা, তাই সকল বস্তু সম্পর্কে অবশ্যই তাঁর জ্ঞান রয়েছে। কুরআনের একাধিক জায়গায় তিনি এটা জানিয়েছেন।[৫৫] তাই তাঁর ব্যাপারে অজ্ঞতার কথা ভাবাই যায় না।

মিথ্যা হলো একটি দোষ,ত্রুটি ও মন্দ বিষয়। আল্লাহ তাআলা সকল দোষ-ত্রুটি ও মন্দ বিষয় থেকে পবিত্র।

তিনি আরশের ঊর্ধ্বে

২৩. তিনি আরশের ঊর্ধ্বে; যেমন তিনি নিজের ব্যাপারে জানিয়েছেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, 'আরশ' তাঁর স্থান বা 'উপর' তাঁর দিক। তাঁর ইসতিওয়া এবং ঊর্ধ্বে সমুন্নত হওয়ার স্বরূপ তিনি ছাড়া এবং সুদৃঢ় জ্ঞানের অধিকারী, যাদের তিনি নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন, তারা ছাড়া কেউ জানে না।

---

[৫৪] *আকায়িদুল ইসলাম* : ৩২
[৫৫] উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য—সুরা মুলক : ১৪

ব্যাখ্যা : আল্লামা তাকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) লেখেন :

'ইসতিওয়া আরবি শব্দ। এর অর্থ সোজা হওয়া, কায়েম হওয়া, আয়ত্তাধীন করা ইত্যাদি। কখনো এ শব্দটি বসা ও সমাসীন হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু শরীর ও স্থান থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তাই তাঁর ক্ষেত্রে শব্দটি দ্বারা এরূপ অর্থ গ্রহণ করা সঠিক নয় যে, মানুষ যেভাবে কোনো আসনে সমাসীন হয়, তেমনিভাবে (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলাও আরশে উপবিষ্ট ও সমাসীন হন। প্রকৃতপক্ষে 'ইসতিওয়া' আল্লাহ তাআলার একটি গুণ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের মতে এর প্রকৃত ধরণ-ধারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তাদের মতে এটা মুতাশাবিহাত (দ্ব্যর্থবোধক) বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত, যার খোড়াখুড়িতে লুপ্ত হওয়া ঠিক নয়। সুরা আলে ইমরানের শুরুভাগে আল্লাহ তাআলা এরূপ মুতাশাবিহ বিষয়ের অনুসন্ধানে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। সে হিসেবে এর কোনো তরজমা করাও সমীচীন মনে হয় না। কেননা, এর যেকোনো তরজমাতেই বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে। এ কারণেই আমরা এ স্থলে তরজমা করিনি। তা ছাড়া এর ওপর কর্মগত কোনো মাসআলাও নির্ভরশীল নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নিজ শান অনুযায়ী 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেছেন; যার স্বরূপ ও প্রকৃতি উপলব্ধি করার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি মানুষের নেই।'[৫৬]

'আমাদের জন্য এতটুকু বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নিজ শান মোতাবেক আরশে 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে এরচে বেশি আলোচনা-পর্যালোচনার দরকার নেই। কেননা, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এর সবটা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।'[৫৭]

---

[৫৬] *তাফসিরে তাওজিহুল কুরআন*, সুরা আ'রাফ : ৫৪-এর তাফসির

[৫৭] *তাফসিরে তাওজিহুল কুরআন*, সুরা ইউনুস : ৩-এর তাফসির

আল্লাহর দর্শন

২৪. কিয়ামাতের দিন তিনি দু-ভাবে মুমিনদের চোখে দৃশ্যমান হবেন।প্রথম পন্থা হলো, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ওপর নিজ সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে উন্মোচিত করবেন, যা যুক্তিভিত্তিক সত্যায়নের চাইতে অধিক হবে। (তা এতটাই গভীর হবে) যেন তা চোখের দর্শনেরই নামান্তর। তবে সেই দর্শনে সামনাসামনি, মুখোমুখী, দিক, বর্ণ এবং আকার থাকবে না। মুতাজিলা এবং অন্যান্য গোষ্ঠীদর্শনের এ পন্থার কথাই বলেছে। বাস্তবে এ বিষয়টি সত্য। কিন্তু তাদের ভুল হলো দর্শনকে এভাবে ব্যাখ্যা প্রদানের মধ্যে কিংবা দর্শনকে এ অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলার মধ্যে। দ্বিতীয় পন্থা হলো, আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন রূপে তাদের সামনে দৃশ্যমান হবেন; যেমনটি সুন্নাহ এবং বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং মুমিনরা আখিরাতে আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে আকার, রূপ, বর্ণ এবং সামনাসামনি দেখতে পাবে, যেমনিভাবে স্বপ্নে দেখা হয়। নবিজি ﷺ বলেন :

رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ

আমি আমার প্রতিপালককে সর্বোত্তম রূপে দেখেছি।[৫৮]

সুতরাং মুমিনরা আখিরাতে আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দেখবে, যেমনিভাবে পৃথিবীতে তারা স্বপ্নে দেখে।

দর্শনের এ দুটো পন্থা আমরা বুঝতে পারি এবং আমরা এর প্রতি বিশ্বাস রাখি; যদিও এর দ্বারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ভিন্ন কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের উদ্দিষ্ট অর্থের প্রতি ইমান রাখি, যদিও আমরা তা সুনির্দিষ্টভাবে না জেনে থাকি।

ব্যাখ্যা : আখিরাতে মুমিনরা আল্লাহ তাআলাকে অতুলনীয়ভাবে দেখতে পাবে। এই দর্শন সত্য ও সঠিক। এই দর্শন সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস

---

[৫৮] *সুনানুদ দারিমি* : ২১৯৫

রয়েছে। কারণ, আল্লাহর সত্তা অতুলনীয়। এই অতুলনীয় সত্তার দর্শনও অতুলনীয় ও নজিরবিহীন হবে। আল্লাহর দর্শন লাভকারী পরম আরাধ্য মহান সত্তার দর্শন লাভ করে অভিভূত হয়ে পড়বে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত ছাড়া অন্যান্য সকল দল আল্লাহর দর্শনকে অস্বীকার করে এবং তারা নিরাকার ও কোনো দিকে সীমাবদ্ধ নয় এমন সত্তার দর্শনকে অসম্ভব মনে করে। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সম্পর্কে বলেন :

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۝ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে আনন্দোজ্জ্বল এবং তারা তাদের প্রভুকে দেখতে থাকবে।[৫৯]

পক্ষান্তরে তিনি কাফিরদের সম্পর্কে বলেন :

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

কখনো নয়! বস্তুত কাফিররা কিয়ামাতের দিন আল্লাহর দর্শন ও সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থাকবে।[৬০]

সায়্যিদুনা মুসা আ. আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন :

رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে দেখা দিন। আমি আপনাকে এক নজর দেখব।[৬১]

আল্লাহ তাআলাকে দেখা যদি অসম্ভব হতো তাহলে মুসা আ. কখনো এমন আবেদন করতেন না। কারণ, আল্লাহর কাছে কোনটা সম্ভব এবং কোনটা অসম্ভব, সে জ্ঞান আল্লাহর নবি-রাসুলগণের থাকবে না—এমনটা তো ভাবাও যায় না।

মুসা আ.-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

[৫৯] সুরা কিয়ামাহ : ২২-২৩
[৬০] সুরা মুতাফফিফিন : ১৫
[৬১] সুরা আরাফ : ১৪৩

لَنْ تَرَانِي

তুমি কিছুতেই আমাকে দেখতে পারবে না।[৬২]

মহান আল্লাহর কুদরতের পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়া ও আখিরাত যদিও একরকম এবং সবকিছু যদিও তাঁরই সৃষ্টি, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সৃষ্টিকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কোনো সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলার নুর ও নুরের ঔজ্জ্বল্য সহ্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং কোনো সৃষ্টিকে সে ক্ষমতা দেননি। যেমন আয়নার মধ্যে বিভিন্ন আকৃতির প্রতিবিম্ব প্রকাশ করার ক্ষমতা দিয়েছেন, কিন্তু পাথর ও মাটিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি; অথচ উভয়ই আল্লাহর সৃষ্টি। অনুরূপভাবে আল্লাহকে দুনিয়াতে দেখার ক্ষমতা দেননি এবং আখিরাতে তাঁকে দেখার যোগ্যতা ও ক্ষমতার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এ কারণে মুসা আ. দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখতে সক্ষম হননি। অপরদিকে দুনিয়ার বাইরের জগতে গিয়ে আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ মিরাজের রাতে আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ করেছেন।

উপরিউক্ত আয়াত ছাড়াও আখিরাতে আল্লাহর দর্শন লাভ সম্পর্কে আরও অনেক প্রামাণ্য আয়াত রয়েছে এবং এ সম্পর্কে এত অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যেমন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا

নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখবে প্রকাশ্যভাবে।[৬৩]

এর ওপর প্রথম শতাব্দীতে ইজমাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা যে সর্বদ্রষ্টা এবং তিনি যে দেখতে সক্ষম, তা কোনো মুসলমানই অস্বীকার করে না। কুরআনে এসেছে :

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

[৬২] প্রাগুক্ত
[৬৩] *সহিহ বুখারি*: ৭৪৩৫

সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?[৬৪]

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমরা যা কিছু করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তা দেখেন।[৬৫]

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[৬৬]

فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ

শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন।[৬৭]

لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

তোমরা দুজন ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি তোমাদের আবেদন শুনছি এবং তোমাদের অবস্থা দেখছি।[৬৮]

আল্লাহ তাআলা যেমন আমাদের দেখেন, অথচ তিনি স্থান ও আবেষ্টন থেকে পবিত্র। তেমনি এটাও সম্ভব যে, বান্দাও আল্লাহকে দেখতে সক্ষম হবে। বান্দা যদিও স্থান ও আবেষ্টনে অবস্থান করে; কিন্তু আল্লাহ তাআলাকে স্থান ধরে রাখতে পারে না। তিনি এসব কিছু থেকে পবিত্র। দর্শন অস্বীকারকারীদের যুক্তি হলো, কোনো কিছুর দর্শন লাভ করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে।

১. যা দেখা হবে, তা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে হবে।

২. সেটা নির্দিষ্ট কোনো দিকে থাকতে হবে।

৩. সেটা যে দেখবে, তার সামনে থাকতে হবে।

---

[৬৪] সুরা আলাক : ১৪
[৬৫] সুরা বাকারা : ১১০; সুরা হাদিদ : ৪
[৬৬] সুরা শুরা : ১১
[৬৭] সুরাতাওবা : ১০৫
[৬৮] সুরা তহা : ৪৬

৪. দ্রষ্টা ও দৃশ্য বস্তুর মধ্যে খুব বেশি দূরত্ব বা খুব বেশি নৈকট্য কোনোটাই থাকতে পারবে না।

৫. দৃশ্য বস্তু পর্যন্ত দৃষ্টির জ্যোতি পৌঁছতে হবে।

এ ছাড়াও তারা কুরআনের নিম্নের আয়াতের মাধ্যমেও দলিল দিয়ে থাকে :

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না। কিন্তু দৃষ্টিসমূহকে তাঁর আয়ত্তাধীন। তাঁর সত্তা অতি সূক্ষ্ম এবং তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত।[৬৯]

অর্থাৎ, তাঁর সত্তা এতই সূক্ষ্ম যে, কোনো দৃষ্টি তাঁকে ধরতে পারে না এবং তিনি এত বেশি ওয়াকিফহাল যে, সকল দৃষ্টিই তাঁর আয়ত্তাধীন এবং সকলের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত। আল্লামা আলুসি রহ. একাধিক তাফসিরবিদের বরাতে এ বাক্যের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং পূর্বাপর লক্ষ করলে এ ব্যাখ্যা খুবই সংগত মনে হয়। প্রকাশ থাকে যে, সাধারণ কথাবার্তায় সূক্ষ্মতা বলতে শারীরিক সূক্ষ্মতা বোঝায়; কিন্তু আল্লাহ তাআলা শরীর থেকে মুক্ত। সুতরাং এ স্থল সে সূক্ষ্মতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ স্তরের সূক্ষ্মতা সেটাই, যাতে শরীরত্বের আভাসমাত্র থাকে না। আল্লাহ তাআলার সত্তাকে সূক্ষ্ম বলা হয়েছে এ অর্থেই।

যারা আল্লাহ তাআলার দর্শনকে অস্বীকার করে, তারা উপরিউক্ত আয়াতের ইদরাক শব্দের অনুবাদ করে 'দেখা'। অথচ এ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পরিবেষ্টন করা এবং কোনো বস্তুর প্রকৃতি ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছা। সুতরাং এই আয়াতের অর্থ হবে, দর্শন শক্তি ও দৃষ্ট আল্লাহকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না এবং আল্লাহর আদি ও অন্তে পৌঁছাতে পারে না।

আর তারা দর্শন সম্ভাবিত হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো আরোপ করে থাকে, সেগুলোও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কারণ, দর্শনের এসব শর্ত দৈহিক দর্শনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর আল্লাহ তাআলা এরূপ দৈহিক বিশেষণ থেকে পবিত্র। অতএব তাঁকে দর্শনের ক্ষেত্রে এসব শর্ত কার্যকরী থাকবে না। তদুপরি

---

[৬৯] সুরা আনআম : ১০৩

জান্নাতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের এমন দৃষ্টিশক্তি দান করবেন, যা এসব শর্ত ছাড়াও দেখতে সক্ষম হবে।

তাঁর ইচ্ছায়ই সব হয়

২৫. আল্লাহ যা চান, তা হয়। তিনি যা চান না, তা হয় না।

ব্যাখ্যা : বান্দার মধ্যে ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই ইচ্ছা স্বাধীন নয়। বরং তা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও ক্ষমতার আওতাধীন। বান্দার মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতা-বহির্ভূত স্বাধীন ইচ্ছা থাকা অসম্ভব। যেহেতু বান্দার অস্তিত্ব, গুণাবলি ইত্যাদি স্বাধীন নয়, তাই সে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী হবে কীভাবে? আল্লাহ বলেন :

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা করেন।[৭০]

এ জন্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমামগণ বলেন, মানুষ ইচ্ছার স্বাধীনতা ও ইচ্ছার পরাধীনতার মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে। কোনো কোনো অর্থে মানুষ স্বাধীন। কারণ, মানুষ তার ইচ্ছা ও ক্ষমতার দ্বারা কাজ করে থাকে। এই কাজ করার ক্ষেত্রে সে অপারগ নয়। কিন্তু ইচ্ছায় সে স্বাধীন নয়। যেমন, মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা শোনে ও দেখে; কিন্তু শোনা ও দেখার ক্ষমতায় সে স্বাধীন নয়। অনুরূপভাবে মানুষ তার কার্যকলাপে স্বাধীন; কিন্তু কাজ করার শক্তিতে স্বাধীন নয়। বরং অপারগ। বান্দা আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতার দ্বারা যে কাজ করে, শরিয়াতের পরিভাষায় তাকে 'কাসব' তথা অর্জন করা বলে। সকল কাজের স্রষ্টা ও অস্তিত্বদানকারী হচ্ছেন আল্লাহ এবং বান্দা কাজের অর্জনকারী। প্রতিদান ও শাস্তি নির্ধারণে এটাই বিবেচ্য। দুর্বলের জন্য দুর্বল ইচ্ছাই সংগত। স্বাধীন ও পরিপূর্ণ ক্ষমতা তো একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার জন্যই। সৃষ্টির জন্য তা সংগতিপূর্ণ নয়। কাদরিয়া ও আহলুস সুন্নাহর

[৭০] সুরা তাকউইর : ২৯

মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাদরিয়ারা বান্দার ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে চায়। আমরা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করি না। অপারগতা ও স্বাধীনতার মধ্যবর্তী ও ভারসাম্যমূলক পন্থাও ইচ্ছার পরাধীনতার মধ্যে গণ্য। শরিয়াতের পরিভাষায় এটাকে 'কাসব' ও 'আমল' বলে। কুরআন মাজিদের সব জায়গায় আল্লাহ 'খালক' তথা সৃষ্টিকে তাঁর নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেছেন এবং 'কাসব' ও 'আমল' তথা অর্জন ও কর্মকে বান্দার দিকে সম্পর্কিত করেছেন।[৭১]

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, বান্দার প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার দ্বারা সংঘটিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষকে কিছু স্বাধীনতা ও শক্তি দান করেছেন, যাতে বান্দা তার নিজস্ব ইচ্ছা ও ক্ষমতার দ্বারা কাজ করতে পারে। দুনিয়াতে যেমন বান্দার ইচ্ছাকৃত কাজের পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি তাকে পরকালেও ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করা হবে।

কুফর এবং অবাধ্যতাও আল্লাহর সৃষ্টি

২৬. কুফর এবং অবাধ্যতা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এবং ইচ্ছার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়; কিন্তু তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট নন।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ বলেন :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

আর আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কিছু করো, সেগুলোকে।[৭২]

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, মানুষের সকল কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা; হোক তা ভালো কিংবা মন্দ। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে পরীক্ষার কেন্দ্র বানিয়েছেন।

[৭১] উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য—সুরা সাফফাত : ৯৬
[৭২] সুরা সাফফাত : ৯৬

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

তিনি সেই সত্তা, যিনি মৃত্যু এবং জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের কে আমলের বিচারে সর্বোত্তম।[৭৩]

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুটো পথ দেখিয়েছেন—হিদায়াতের পথ এবং গোমরাহির পথ। তিনি বলেন :

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

আর আমি তাকে দুটো পথ দেখিয়েছি।[৭৪]

এরপর তিনি বান্দাকে ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা দিয়েছেন। অন্যথায় পরীক্ষার কোনো অর্থ থাকে না। এখন বান্দা তার ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করে হয়তো ভালোকে গ্রহণ করে নেয় কিংবা সে মন্দকে গ্রহণ করে নেয়। সুরা ফাতিহার তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসকে বিচার দিবস বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং সেদিন মানুষের বিচার করা হবে। সকল আমলের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেওয়া হবে। সেদিন এই কথা বলে মুক্তি পাওয়া যাবে না যে, কুফর এবং অবাধ্যতাও তো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এবং ইচ্ছার কারণেই সংঘটিত হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তাআলা সবাইকে ভালো এবং মন্দ সুস্পষ্টভাবে চিনিয়ে দিয়েছেন, জান্নাতের পথ এবং জাহান্নামের পথ আলাদা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এরপর যে ধ্বংস হবে, সে তো নিজের কৃতকর্মের কারণেই ধ্বংস হবে।

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

যেন যে ধ্বংস হওয়ার সে প্রমাণসাপেক্ষেই ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকার সে প্রমাণসাপেক্ষেই জীবিত থাকে।[৭৫]

---

[৭৩] সুরা মুলক : ২

[৭৪] সুরা বালাদ : ১০

[৭৫] সুরা আনফাল : ৪২

খোলাসা কথা হলো, মহান আল্লাহ তাআলা ভালো-মন্দ উভয়ের স্রষ্টা। কিন্তু তিনি ভালো-মন্দ উভয়ের স্রষ্টা হলেও তিনি ভালোর প্রতি সন্তুষ্ট এবং মন্দের প্রতি অসন্তুষ্ট। আলো ও আঁধার, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা, ফেরেশতা ও শয়তান, নেক ও বদ ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্ট। কিন্তু তিনি নেকির প্রতি সন্তুষ্ট এবং মন্দ কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট। ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি এই দুইটি শব্দের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পথনির্দেশ করেছেন। অন্যান্য দলসমূহ এই পথনির্দেশ না পাওয়ায় পথভ্রষ্ট হয়েছে।

তিনি চিরনির্মুখাপেক্ষী

২৭. তিনি চিরনির্মুখাপেক্ষী। তিনি তাঁর সত্তা এবং গুণের ক্ষেত্রে কোনো কিছুর দিকে মুখাপেক্ষী হন না।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা চিরনির্মুখাপেক্ষী। তিনি অভাবমুক্ত। কোনো তাঁর অস্তিত্বের ক্ষেত্রে কারও দিকে মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর গুণাবলির ক্ষেত্রেও কারও দিকে মুখাপেক্ষী নন। কুরআন মাজিদে এসেছে :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

হে মানুষসকল, তোমরাই আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ তো অমুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসিত।[৭৬]

আকাশসমূহ ও পৃথিবীর যিনি মালিক, তাঁর অভাব ও মুখাপেক্ষিতার ধারণা অমূলক। কুরআনে এসেছে :

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

---

[৭৬] সুরা ফাতির : ১৫

> তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তাঁর সত্তা পবিত্র। তিনি তো অমুখাপেক্ষী।[৭৭] আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা তাঁরই। তোমাদের কাছে এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ, যার কোনো জ্ঞান তোমাদের নেই?[৭৮]

সৃষ্টিজীব আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে এবং আল্লাহর ইবাদত করবে তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে। এর প্রতি আল্লাহর কোনো মুখেপেক্ষিতা নেই। আল্লাহ তাআলা সকল কিছু থেকে চিরনির্মুখাপেক্ষী। তিনি মানুষের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

> কেউ (হজের বিধান) অস্বীকার করলে সেটা তার ব্যাপার। বস্তুত আল্লাহ বিশ্বজগত থেকে অমুখাপেক্ষী।[৭৯]

তিনি সকল বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্ত

২৮. তাঁর ওপর সিদ্ধান্ত আরোপকারী কেউ নেই। আর অন্য কারও অপরিহার্য করার দ্বারা কোনো কিছু তাঁর ওপর অপরিহার্য হয় না। হ্যাঁ, কখনো তিনি (নিজ অনুগ্রহে) কোনো কিছুর অঙ্গীকার করেন। এরপর তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেন। যেমনিভাবে হাদিসে বিবৃত হয়েছে যে, তা আল্লাহ তাআলার জিম্মা হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর জন্য কোনো কিছু করা অত্যাবশ্যক নয়। যেকোনো বাধ্যবাধকতা ও অপরিহার্যতা আরোপে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, ফলে

[৭৭] সন্তানের প্রয়োজন হয় কোনো না কোনো মুখাপেক্ষিতার কারণে। অর্থাৎ সন্তান দুনিয়ার কাজ-কর্মে পিতার সাহায্য করবে কিংবা নিদেনপক্ষে তার দ্বারা পিতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। আল্লাহ তাআলার এ দুটো বিষয়ের কোনোটিরই প্রয়োজন নেই। কাজেই তিনি সন্তান দিয়ে কী করবেন?

[৭৮] সুরা ইউনুস : ৬৮

[৭৯] সুরা আলে ইমরান : ৯৭

তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এমন স্পর্ধা কার, যে আল্লাহর ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারে! মুতাজিলারা বলে, যে বস্তু বান্দার জন্য ভালো ও মঙ্গলজনক, তার প্রতি লক্ষ রাখা আল্লাহর জন্য অপরিহার্য। অন্যথায় আল্লাহর ওপর কার্পণ্য আরোপিত হবে। উপরিউক্ত বক্তব্য মুতাজিলাদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও বেয়াদবির পরিচায়ক। কৃপণতার অর্থ হলো কোনো অবশ্য কর্তব্য পালন না করা। অথচ আল্লাহর ওপর কারও কোনো অধিকার নেই। তিনি সবকিছুর মালিক ও চির স্বাধীন। তাঁর ওপর বিনয় প্রদর্শন ওয়াজিব নয় এবং ক্রোধ প্রদর্শনও ওয়াজিব নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। হিদায়াতের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই, অথচ এই হিদায়াতও তাঁর ওপর অপরিহার্য নয়। আল্লাহ বলেন :

فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

> আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তোমাদের সকলকে হিদায়াত দিয়ে দিতেন।[৮০]

আল্লাহ তাআলা কোনো বিশেষ রহস্যের কারণে সকলকে হিদায়াত দান করেননি। বোঝা গেল যে, হিদায়াত দান করতে আল্লাহ বাধ্য নন। তিনি যদি তাঁর করুণার দ্বারা কাউকে হিদায়াত দিয়েই দেন তাহলেও হিদায়াতপ্রাপ্তকে সওয়াব দেওয়া তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তিনি যদি সওয়াব দান করেন তবে তা তাঁর অপার অনুগ্রহ। আর যদি শাস্তি দান করেন তবে তা-ও তিনি করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহে, ন্যায়বিচারে ও ক্রোধে সর্বাবস্থায় প্রশংসিত ও প্রশংসনীয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার ওপর কারও কোনো অধিকার নেই। তবে মহান আল্লাহ তাঁর অসীম করুণার নিদর্শনস্বরূপ ইমানদারগণকে মর্যাদা দান করে বলেন : 'আমার ওপর মুমিনদের হক রয়েছে। আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাত দান করব এবং তাদের সৎকাজের সওয়াব দান করব।'

মুমিনদের সৎকাজের সওয়াব প্রদান ও জান্নাত দান করা একমাত্র তাঁর অঙ্গীকারের ভিত্তিতে করা হবে; আমাদের পাওনা ও দাবির ভিত্তিতে নয়। হিদায়াতও তাঁরই করুণ ও অনুকম্পার দান। তাঁর দেওয়া সামর্থ্যের দ্বারা

[৮০] সুরা আনআম : ১৪৯

আমরা ইমান এনেছি এবং তাঁর দেওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা সৎকাজ করে থাকি। সবকিছুই তাঁর অনুগ্রহে হয়ে থাকে। তিনিই হিদায়াত দান করে জান্নাত দানের অঙ্গীকার করেছেন।

তিনি প্রজ্ঞাময়

২৯. আল্লাহ তাআলার সকল কাজের মধ্যে হিকমাত এবং সার্বিক কল্যাণকামিতা থাকে; যার ব্যাপারে তিনিই সম্যক অবগত। আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো বস্তুবিশেষের প্রতি সর্বাধিক কল্যাণের ফায়সালা করা অপরিহার্য নয়।

ব্যাখ্যা : মুতাজিলাসহ অনেক বাতিল গোষ্ঠী এই আকিদা পোষণ করে যে, বান্দার জন্য যা সর্বাধিক কল্যাণকর, আল্লাহর জন্য সেই ফায়সালা করা অপরিহার্য।অথচ আল্লাহ তাআলা সকল অপরিহার্যতা থেকে মুক্ত। তিনি সবকিছুর মালিক ও চির স্বাধীন।হ্যাঁ, তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ। যেহেতু তিনি সবকিছুর প্রকাশ্য ও গুপ্ত এবং সবকিছুর প্রকৃত স্বরূপ ও মূল রহস্য সম্বন্ধে অবগত, তাই তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ। তাঁর এই পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতেই তাঁর সব কাজ-কর্ম ও কথা হয়ে থাকে প্রজ্ঞাময়। হিকমত বলা হয় পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে কাজ, কর্ম ও কথা পাকাপোক্ত হওয়া। আল্লাহ তাআলার সত্তায় এই গুণ সবচে বেশি প্রকাশিত। তাই তিনি প্রজ্ঞাময়। তবে তাঁর প্রজ্ঞার ব্যাপারে তিনিই সবচে বেশি অবগত। বান্দার সাধ্য নেই সব ব্যাপারে তাঁর প্রজ্ঞা অনুধাবন করার। কুরআনে এসেছে :

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছুই জানেন। তিনিই মহা প্রাজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে অবহিত।[৮১]

মুতাজিলাদের মতবাদ যে সঠিক নয়, কুরআনেই এর প্রমাণ রয়েছে :

[৮১] সুরা আনআম : ৭৩

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

যদি আপনার প্রতিপালক চাইতেন তাহলে পৃথিবীতে যারা রয়েছে তাদের সবাই-ই ইমান আনয়ন করত।[৮২]

এখানে লক্ষণীয় যে, নিঃসন্দেহে হিদায়াত প্রত্যেকের জন্য কল্যাণকর। এতদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা হিদায়াতকে তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং সাথে এ-ও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি সবাইকে হিদায়াত করেননি। সুতরাং বোঝা গেল, আমাদের দৃষ্টিতে কল্যাণকর বিবেচিত হলেই তা আল্লাহর জন্য জরুরি নয়।

তাঁর থেকে কোনো মন্দ বিষয় সংঘটিত হয় না

৩০. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো মন্দ বিষয় সংঘটিত হয় না।

ব্যাখ্যা : সুতরাং পৃথিবীতে যত মন্দ ও অনিষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, তা সৃষ্টিজীবের নিজস্ব কামাই। আল্লাহ তাদের ওপর তা চাপিয়ে দেননি। তদুপরি আল্লাহ তাআলা তা-ও নির্ধারণ করেছেন কোনো কল্যাণের জন্য। যেমন, আল্লাহ বলেন :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

মানুষ নিজ হাতে যা কামায়, তার ফলে স্থলে ও জলে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়ে—আল্লাহ তাদেরকে তাদের কতক কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন সে জন্য। হয়তো তারা ফিরে আসবে।[৮৩]

সুতরাং দুনিয়ায় যে ব্যাপক বালা-মসিবত দেখা দেয়—যেমন, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ভূমিকম্প, শত্রুর আগ্রাসন,জালিমের আধিপত্য ইত্যাদি—এসবের প্রকৃত কারণ ব্যাপকভাবে আল্লাহ তাআলার বিধান অমান্য করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। এভাবে এসব বিপদাপদ চাপান এ জন্য, যাতে মানুষের মন

[৮২] সুরা ইউনুস : ৯৯
[৮৩] সুরা রুম : ৪১

কিছুটা নরম হয় এবং দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়। প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ায় যেসব বিপদাপদ দেখা দেয়, অনেক সময় তার বাহ্যিক কারণও থাকে; যা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী আপন কার্য প্রকাশ করে। কিন্তু এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই কারণও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি এবং বিশেষ সময়ে, বিশেষ স্থানে তার সক্রিয় হওয়াটাও আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি নিজের সে ইচ্ছা সাধারণত মানুষের পাপাচারের ফলেই কার্যকর করেন। এভাবে এ আয়াত শিক্ষা দিচ্ছে, সাধারণ বালা-মসিবতের সময় নিজেদের গোনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা ও ইসতিগফারে লিপ্ত হওয়া চাই; যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তা বাহ্যিক কোনো কারণে ঘটিত বিষয়।

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

সেই বড় শাস্তির আগে আমি তাদেরকে অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব। হয়তো তারা ফিরে আসবে।[৮৪]

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

কখনো নয়! বরং তারা যেসব কাজ করছে, তা তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে।[৮৫]

এ থেকে বোঝা গেল, আল্লাহ তাআলার নির্ধারণের ভেতর কোনো মন্দ বিষয় নেই। কারণ, সবকিছুর পেছনে নিগূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য কার্যকর রয়েছে। আমরা যেসবমন্দ বিষয় দেখি, তা হলো কেবলই পরিণাম ও ফলাফল।

---

[৮৪] সুরা সাজদা : ২১
[৮৫] সুরা মুতাফফিফিন : ১৪

তিনি সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ

৩১. কোনো কাজ অথবা কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার দিকে জুলুম অথবা ইনসাফহীনতার নিসবত করা যায় না।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ সারাবিশ্বের মালিক এবং অসীম শক্তির অধিকারী। সকল বান্দা তাঁর অধীনস্থ দাস। তিনি যে আদেশ করেন, তা সকলের জন্য কল্যাণকর ও যুক্তিযুক্ত হয়ে থাকে। তিনি অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা থেকে পবিত্র। তিনি যদি সকলকে বিনাদোষে জাহান্নামে দেন এবং অনন্তকাল ধরে শাস্তি দিতে থাকেন তাহলেও এতে কারও প্রতিবার করার মতো কিছু নেই। এটা তাঁর অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপও নয় যে অবিচার বা অত্যাচার হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে। আমাদের সম্পদ, যার প্রকৃত মালিকানাও আমাদের নয়; আল্লাহ তাআলা তাঁর করুণা দ্বারা আমাদেরকে এ সকল সম্পদের অধিকারী করেছেন। আল্লাহ আমাদের যতটুকু সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, ঠিক ততটুকু সম্পদ আমাদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ। কিন্তু এই সাময়িক মালিকানাপ্রাপ্ত সম্পদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি তার অধীনস্থ কোনো প্রাণীকে জবাই করে তবে তা বৈধ হবে; জুলুম হবে না। তেমনি আল্লাহ যদি কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেন—যদিও তিনি কখনো এমন করবেন না[৮৬]—তবে তা-ও জুলুম হবে না। কারণ, জুলুমের অর্থ হলো অন্যের মালিকানাভুক্ত কোনো সম্পদ মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবহার করা। আর এটা তো সর্বজনবিদিত যে, বিশ্বের কোনো বস্তুই আল্লাহর মালিকানার বাইরে নয়। আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।[৮৭]

---

[৮৬] দ্রষ্টব্য—সুরা আলে ইমরান : ৯; সুরা নিসা : ১২২
[৮৭] সুরা নিসা : ৪০

হিকমতের প্রতি লক্ষ রাখা নিরেট তাঁর অনুগ্রহ

৩২. আল্লাহ তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেন এবং যা কিছু তিনি আদেশ করেন, সব ব্যাপারে তিনি হিকমাতের প্রতি লক্ষ রাখেন। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, তিনি তাঁর সত্তা কিংবা গুণাবলির ক্ষেত্রে কোনো কিছুর মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জন করেন।

ব্যাখ্যা : সব কাজে হিকমাতের প্রতি লক্ষ করার বিষয়টি নিরেট আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। এমন নয় যে, হিকমাত রক্ষা করা তাঁর সত্তা কিংবা গুণাবলির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করে; অন্যথায় তা অপূর্ণ থেকে যায়।

তিনি সকল প্রয়োজন ও স্বার্থ থেকে পবিত্র

৩৩. তাঁকে কোনো প্রয়োজন অথবা স্বার্থের দিকে সম্পর্কিতও করা যাবে না। কারণ, তা দুর্বলতা এবং মন্দ কথা।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা মহাশক্তির আধার। তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি চিরনির্মুখাপেক্ষী। তিনি যা কিছু করেন, সব নিজের অভিপ্রায় থেকে করেন। কেউ তাকে বাধ্য করতে পারে না। তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি কোনো স্বার্থের দ্বারা তাড়িত হন না। এসবই দুর্বলতা ও ত্রুটি। আল্লাহ তাআলার শানের সঙ্গে অসামাঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি তো সকল প্রকার ত্রুটি, দুর্বলতা ও মন্দ বিষয় থেকে পবিত্র।

মানুষের বিবেক অপূর্ণ

৩৪. তিনি ছাড়া অন্য কোনো সিদ্ধান্তদাতা নেই। সুতরাং বস্তুর উত্তমতা-কদর্যতা নির্ধারণে বিবেকের সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার নেই। একইভাবে কোনো কাজকে প্রতিদান ও শাস্তির কারণ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও বিবেকের সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা নেই। বস্তুর উত্তমতা-

কদর্যতা আল্লাহ তাআলার ফায়সালা এবং সিদ্ধান্তক্রমে স্থির হয়ে থাকে। (বস্তুর উত্তমতা-কদর্যতা এ জন্য একমাত্র তিনি কর্তৃকস্থিরীকৃত, কারণ) তিনি মানুষকে শরিয়ত পালনের মুকাল্লাফ বানিয়েছেন। সুতরাং এর কিছু বিষয় এমন, মানুষের বিবেক যার কারণ এবং প্রতিদান কিংবা শাস্তির সঙ্গে তার হিকমাত ও সামঞ্জস্যতা বোধগম্য করতে পারে। আর কিছু বিষয় এমন, মানুষের বিবেক যা বোধগম্য করতে পারে না, যতক্ষণ না রাসুলগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তা জানিয়ে দেন।

ব্যাখ্যা : মুতাজিলারা মনে করে, বস্তুর উত্তমতা-কদর্যতা নির্ধারণ করবে মানুষের বিবেক। মানুষ নিজেই তার বিবেকের দ্বারা ফায়সালা করবে, কোন বস্তুটি কল্যাণকর আর কোনটি অকল্যাণকর; কোনটি গ্রহণীয় আর কোনটি বর্জনীয়। এককথায়, ভালো ও মন্দের ধারণা কেবল বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাই সম্ভব। এ জন্য তারা বলে, শরিয়তের বিধান জানা না থাকলেও বা শরিয়ত কারও কাছে না পৌঁছে থাকলেও মানুষ মুকাল্লাফ। অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা ভালো-মন্দ বিবেচনা করে কর্তব্য পালনে বাধ্য। কারণ, ভালো-মন্দ যাচাই করার মতো বিবেক-বুদ্ধি তার আছে। মুতাজিলারা নবি ﷺ-এর হাদিসের ক্ষেত্রেও বিবেককে বিচারক মনে করে।লেখক রহ. এখানে তাদের সেই অসার ধারণাকে খণ্ডন করলেন।

তাঁর গুণসমূহ তাঁর সত্তার মতোই একক

৩৫. আল্লাহ তাআলার গুণাবলির মধ্য থেকে প্রতিটি গুণ সত্তাগত বিবেচনায় একক এবং (মাখলুকের সঙ্গে)সম্পৃক্ততার বিবেচনায় অসীম। অনিত্যত্ব স্রেফ ওই অনিত্য বিষয়ের মধ্যে, যার সঙ্গে তাঁর গুণ সম্পৃক্ত হয়।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ যেমন একক, তেমনি তাঁর গুণসমূহ সত্তাগত বিবেচনায় একক। কারণ, আল্লাহ তাআলার গুণসমূহই তাঁর সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, আবার তা তাঁর সত্তা-বহির্ভূতও নয়; বরং তা তাঁর সত্তার অপরিহার্য অংশ।

কারণ, গুণ গুণান্বিত বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় না, আবার তা থেকে পৃথকও হয় না। তাই আল্লাহ তাআলার এককত্বে বিশ্বাস করতে হলে তাঁর গুণাবলির এককত্বেও বিশ্বাস করতে হবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার সকল গুণ সত্তাগত বিবেচনায় একক। তবে সেই গুণগুলো যখন সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়—যেমন, তাঁর একটি গুণ হলো দয়া। যখন তিনি মাখলুকের প্রতি দয়া করেন—তখন মাখলুকের সংখ্যা অনুপাতে তা-ও সীমাহীন হতে থাকে। তবে সত্তাগত বিবেচনায় তাঁর মধ্যে এককত্বই রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা যেমন চিরন্তন, তেমনি তাঁর গুণাবলিও চিরন্তন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার গুণের ক্ষেত্রে দুটো দিক রয়েছে। একটি হলো তার সত্তাগত বিবেচনা, আরেকটি হলো তা মাখলুকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার বিবেচনা। সত্তাগত বিবেচনায় আল্লাহ তাআলার সকল গুণ তাঁর সত্তার মতোই চিরন্তন। কিন্তু সে সকল গুণ যেসব মাখলুকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, সেই মাখলুকগুলো অনিত্য হওয়ার কারণে সেগুলোর মধ্যে অনিত্যত্ব থাকে। অর্থাৎ তাঁর গুণসমূহ চিরন্তন। আর অনিত্য বিষয়ের সঙ্গে তা যখন সম্পৃক্ত হয় তখন তার মধ্যে যে অনিত্যত্ব দেখা দেয়, তা মূলত তার অনিত্যত্ব নয়; বরং অনিত্য মাখলুকের অনিত্যত্ব, যার সঙ্গে তা যুক্ত হয়েছে।

ফেরেশতা আল্লাহর সৃষ্টি

৩৬. আল্লাহ তাআলার রয়েছে অনেক ফেরেশতা, যারা ঊর্ধ্বজগতে অবস্থান করে এবং যারা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত। রয়েছে আরও অন্যান্য ফেরেশতা, যারা মানুষের আমল লেখা, বান্দাকে ধ্বংসাত্মক বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত রাখা এবং কল্যাণের দিকে আহ্বান করার কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তারা বান্দার অন্তরে কল্যাণমূলক ভাবনা জাগ্রত করে। প্রত্যেকের রয়েছে নির্ধারিত অবস্থান। আল্লাহ তাআলা তাদের যা কিছুর আদেশ দিয়েছেন, তারা তার কোনোটিই অমান্য করে না। তাদেরকে যা কিছু আদেশ করা হয়, তারা তা সবই পালন করে।

<u>ব্যাখ্যা :</u> ফেরেশতা সম্পর্কে আমাদের আকিদা হলো :

(১) ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার সম্মানিত বান্দা।

(২) তারা আল্লাহর নাফরমানিজনিত পাপ থেকে পবিত্র। তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তারা তা পালন করেন।

(৩) আল্লাহর বার্তা বহন, দৌত্য ও প্রচারকার্য তথা তাঁর পবিত্র বিধিবিধান পৌঁছানোর দায়িত্বে তারা নিয়োজিত।

(৪) নবিগণের ওপর আল্লাহ তাআলার কিতাব ও সহিফা ফেরেশতাদের দ্বারাই অবতীর্ণ হয়।

(৫) ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার সকল বিধান অত্যন্ত আমানত ও হিফাজতের সঙ্গে পৌঁছিয়ে থাকেন এবং সকল ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকেন। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবিদের কাছে যা কিছু পৌঁছিয়েছেন, তার সব কিছুই সত্য ও সঠিক। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা নেই।

(৬) ফেরেশতাগণ খাওয়া-পরা, জন্ম-মৃত্যু, জন্মদান ও বংশবিস্তার ইত্যাদি থেকে পবিত্র।

(৭) ফেরেশতাগণ নুরের তৈরি। তারা নিজেদেরকে যেকোনো আকৃতিতে প্রকাশিত করতে পারেন। তাদের শরীর পোশাকের সমতুল্য।

(৮) ফেরেশতাগণ অগণিত। তাদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন।

(৯) ফেরেশতাগণ সব সময় আল্লাহর ইবাদত ও তার তাসবিহে মাশগুল থাকেন। তারা কখনো আল্লাহর ইবাদতে ক্লান্তি বোধ করেন না।

(১০) আল্লাহ তাদের যে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন, তারা সেই কাজেই ব্যাপৃত থাকেন।

ফেরেশতাদের শ্রেণি বিভাগ রয়েছে। আকাশসমূহ ও পৃথিবী, এমনকি সৃষ্টিকুলের সকল অংশে ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তারা সৃষ্টলোকের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত। ফেরেশতাদের অস্তিত্ব

ও শ্রেণি বিভাগ কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ও নবিগণের ওপর নাজিলকৃত কিতাব ও সহিফায় ফেরেশতাদের উল্লেখ রয়েছে। সকল নবির প্রচারিত শরিয়ত ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে একমত। ফেরেশতাদের সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা দীনের অপরিহার্য অঙ্গ। অবিশ্বাসী কাফিররা ফেরেশতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই অস্বীকৃতি সম্পর্কে তাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। অযৌক্তিকভাবে তারা কেবল বলে যে, আমরা ফেরেশতাদের দেখি না এবং আমাদের কাছে ফেরেশতাদের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই। তাদের এহেন অযৌক্তিক ধারণা খণ্ডন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, কোনো বস্তু না দেখা অথবা না জানা এবং প্রমাণিত না হওয়া জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ওই বস্তুকে অস্বীকার করার অজুহাত হতে পারে না। সকল ফেরেশতার মধ্যে চারজন আল্লাহর অধিক নৈকট্যের অধিকারী।

ক. জিবরিল আ. নবিগণের নিকট ওহি নিয়ে আসতেন। আল্লাহর ওহি নবি-রাসুলগণের নিকট নিয়ে আসাই ছিল তার কাজ।

খ. মিকাইল আ. আল্লাহ তাআলার নির্দেশে সৃষ্টিকুলের রিজিক বণ্টন করার কাজে নিয়োজিত।

গ. ইসরাফিল আ. কিয়ামাতের দিনে আল্লাহর নির্দেশে শিংগা ফোঁকার দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ. মালাকুল মাউত আ. সকল জীবের প্রাণ হরণের কাজে নিয়োজিত।

অধিকাংশ আলিমের মতে হজরত জিবরিল আ. ফেরেশতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা কতিপয় হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কোনো কোনো আলিমের মতে ওই চারজন ফেরেশতারাই সমমর্যাদার অধিকারী।

ফেরেশতাদের প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইসলামপন্থীগণ মনে করেন যে, ফেরেশতাদের আকৃতি ও অবয়ব নুরের এবং তাদেরকে নুর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা যেকোনো কঠিন কাজ করতে সক্ষম। তারা যেকোনো আকার-আকৃতি ধারণ করতে পারেন। দার্শনিকদের মতে ফেরেশতারা বস্তুগত অবয়বহীন সত্তা।

শয়তান আল্লাহর সৃষ্টি

৩৭. আল্লাহ তাআলার মাখলুকের মধ্যে আরও রয়েছে শয়তান। শয়তান মানুষের অন্তরে মন্দ চাহিদা জাগ্রত করে।

ব্যাখ্যা : শয়তান আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা তাকে বিশেষ কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার কেন্দ্র, তাই আল্লাহ তাআলা এখানে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে একদিকে যেমন উত্তম চাহিদা জাগ্রতকারী ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন এবং তাকে পথপ্রদর্শনকারী কিতাব ও সুন্নাহর দ্বারা সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন, একইভাবে তিনি মন্দ চাহিদা জাগ্রতকারী নফস ও শয়তানও সবার সঙ্গে নিয়োজিত করেছেন। যাতে করে মানুষের সামনে জান্নাতের পথ ও জাহান্নামের পথ, সাফল্যের পথ ও ব্যর্থতার পথ উভয়টিই সুস্পষ্ট থাকে। এরপর মানুষ তার ইচ্ছানুসারে যথাযথ পথ গ্রহণ করে।

কুরআন আল্লাহর কালাম

৩৮. কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম। আল্লাহ তাআলা তা ওহি মারফত আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন।

ব্যাখ্যা : কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার কালাম এবং তা চিরন্তন ও অসৃষ্ট। কুরআন মাজিদকে আল্লাহ স্বয়ং তাঁর কালাম বলে অভিহিত করেছেন এবং তাকে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বলেছেন :

حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ

যখন তারা আল্লাহর কালাম শুনবে।[৮৮]

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার কালাম এবং কালাম তথা কথা বলা আল্লাহর একটি গুণ। আল্লাহ তাআলা তাঁর গুণাবলিতে চিরন্তন। এ ব্যাপারে পুরো উম্মাহ একমত। মহান আল্লাহ অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত কথা

[৮৮] সুরা তাওবা : ৬

বলার শক্তির অধিকারী। তিনি কখনো কথা বলার সামর্থ্যহীন ছিলেন না। নবি-রাসুলগণের ওপর নাজিলকৃত সকল আসমানি কিতাব ও সহিফা আল্লাহর বক্তব্যের বিবরণ। আল্লাহর কালাম একক ও বিশিষ্ট। নাজিলকৃত সকল কিতাব ও সহিফা তাঁর অবিমিশ্র কালাম; যা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে।

ওহির হাকিকত

৩৯. কোনো মানুষের এ ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ তার সঙ্গে (সামনাসামনি) কথা বলবেন। তবে ওহির মাধ্যমে (বলতে পারেন) অথবা কোনো পর্দার আড়াল থেকে কিংবা তিনি কোনো বার্তাবাহী (ফেরেশতা) পাঠিয়ে দেবেন, যে তাঁর নির্দেশে তিনি যা চান, সেই ওহির বার্তা পৌঁছে দেবে। এটাই হলো ওহির হাকিকত।

ব্যাখ্যা : এ দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলেন না। কেননা মানুষের তা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি তিনটি পদ্ধতির কোনো একটি গ্রহণ করেন। (এক) একটি পদ্ধতিকে তিনি ওহি নামে অভিহিত করেছেন। তার মানে তিনি যে কথা বলতে চান, তা কারও অন্তরে ঢেলে দেন। (দুই) দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো পর্দার আড়াল থেকে কথা বলা। অর্থাৎ কে বলছে তা দেখা ছাড়াই তার কথা কানের মাধ্যমেই শুনতে পাওয়া। যেমন হজরত মুসা আ.-এর সঙ্গে এভাবে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছিলেন। (তিন) নিজ বাণী কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে কোনো নবির কাছে পাঠানো।

তাঁর নাম ও গুণসমূহ শ্রুতিনির্ভর

৪০. আল্লাহ তাআলার নামসমূহ এবং গুণাবলিতে কোনো ধরনের সংযোজন জায়িয নেই। আল্লাহ তাআলার ওপর কোনো নাম অথবা কোনো গুণ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে শরিয়তের ওপর নির্ভর করা

অপরিহার্য। সুতরাং যে নাম ও গুণ শরিয়তে বিবৃত হয়েছে, তা প্রয়োগ করা যাবে এবং যে নাম ও গুণ শরিয়তে বিবৃত হয়নি, তা প্রয়োগ করা যাবে না।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ তাআলার নামসমূহ স্বয়ং আল্লাহর নিকট থেকে শোনার ওপর নির্ভরশীল। সৃষ্টিজীব নিজেই তাঁর গুণ উপলব্ধি করতে অপারগ। তাই চিরন্তন সত্তার নাম ও গুণ সেই সত্তা কর্তৃক বিবৃত করে না দেওয়া পর্যন্ত কী করে জানা সম্ভব! শরিয়তে আল্লাহ তাআলার সত্তায় যে নাম প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই নাম প্রয়োগ করাই বৈধ এবং যে নাম প্রয়োগ করা হয়নি, তা প্রয়োগ করা উচিত নয়। যদিও সেই নামে পরিপূর্ণ অর্থ পাওয়া যাওয়ার কারণে তার প্রয়োগ ঠিক হয়,তবু তা করা উচিত নয়। যেমন আল্লাহ তাআলাকে শাফি তথা আরোগ্যকারী বলা যাবে; কিন্তু চিকিৎসক বলা যাবে না। কারণ, প্রথম নামটি শরিয়তে বিবৃত হয়েছে আর দ্বিতীয় নামটি বিবৃত হয়নি।

সুতরাং নিজের থেকে কোনো নাম অথবা গুণ উদ্ভাবন করে তা আল্লাহ তাআলার দিকে সম্পর্কিত করা যাবে না। আল্লাহ তাআলার দিকে একমাত্র তা-ই সম্পর্কিত করা যাবে, যা কুরআনের কোনো সুস্পষ্ট আয়াতে অথবা রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

দৈহিক পুনরুত্থান

৪১. (কিয়ামতের দিন) দৈহিক পুনরুত্থান সত্য। সেদিন দেহসমূহ একত্রিত করা হবে এবং তার মধ্যে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সেদিন দেহসমূহ সেসব দেহই হবে, যেগুলো দুনিয়াতে ছিল; শরিয়াতের পরিভাষায় এবং মানবসমাজে দেহ বলে যা পরিচিত। হ্যাঁ, সেদিন অনেক দেহ অতিকায় হবে এবং অনেক দেহ খাটো হবে। যেমন, হাদিসে এসেছে : কাফিরের দাঁত উহুদ পাহাড়ের অনুরূপ হবে। একইভাবে অনেক দেহ হবে অতি সূক্ষ্ম এবং পবিত্র, যেমন হাদিসে জান্নাতবাসীদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হলো, একটি শিশু ঠিক সে মানুষটিই, একসময় যে যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং

পরবর্তীতে একসময় যে বুড়িয়ে যায়। তার দেহের অংশগুলো যদি হাজারবারও পরিবর্তিত হয়, এরপরও মানুষটি কিন্তু অভিন্নই থাকে।

ব্যাখ্যা : সকল মুসলমানের সম্মিলিত বিশ্বাস যে, দৈহিক পুনরুত্থান সত্য। কুরআন মাজিদের অসংখ্য আয়াত ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অগণিত হাদিস দ্বারা এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, পুনরুত্থান ও হাশর দেহের সঙ্গেই হবে এবং এই দুনিয়ার দেহের অনুরূপ দৈহিক অবয়ব হবে এবং তাতে আত্মা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত এবং নবি কারিম ﷺ-এর হাদিস এত স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, এ বিষয়ে মনগড়া কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ নেই।

তদুপরি দুনিয়াতে আত্মা ও শরীরই ছিল আল্লাহর বিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিত্ব। সুতরাং দুনিয়াতে আত্মা ও শরীরের যে সম্পর্ক ছিল, আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রেও আত্মার সঙ্গে শরীরের সেই সম্পর্ক থাকবে। আত্মা ও শরীর দুনিয়াতে যেমন একসঙ্গে সম্পৃক্ত ও অবিচ্ছেদ্য ছিল, অনুরূপভাবে আখিরাতে তা একত্রিত হবে এবং পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে উভয়ে শরিক হবে।

কিয়ামত-সম্পর্কিত আকিদা

৪২. আমলের প্রতিদান এবং হিসাব-নিকাশ সত্য। পুলসিরাত সত্য। মিজান (আমল মাপার দাঁড়িপাল্লা) সত্য। জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য।

ব্যাখ্যা : কিয়ামতের দিন দুনিয়ার সকল কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণ সত্য ও সঠিক এবং কৃতকর্ম ওজন করার জন্য যে পাল্লা ব্যবহার করা হবে, তা-ও সত্য। যার নেক কাজের পাল্লা হালকা হবে, সেদিন সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হিসাবকৃত আমল সম্পর্কে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দেওয়াও সত্য ও সঠিক। নেককারদের আমলনামা দেওয়া হবে তাদের ডান হাতে এবং পাপীদের আমলনামা দেওয়া হবে তাদের বাম হাতে। দাঁড়িপাল্লায় আমল তুলাদণ্ডে ওজন করা হবে। এ দাঁড়ির দুটো পাল্লা থাকবে। একটি পাল্লায় নেক কাজগুলো তোলা হবে। আর

অপর পাল্লায় পাপ কাজগুলো ওজন করা হবে। ওই দাঁড়িপাল্লার আসল হাকিকত ও ওজনের প্রকৃত অবস্থা কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন।

পুলসিরাত হলো জাহান্নামের ওপর নির্মিত একটি সরু পথ। মুমিন বান্দারা এটা অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামিরা পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় পা ফসকে জাহান্নামে পতিত হবে। মানুষের কৃতকর্ম মিজানের পাল্লায় ওজন করার পর পুলসিরাত অতিক্রম করার নির্দেশ দেওয়া হবে। সর্বপ্রথম আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর উম্মতকে নিয়ে পুলসিরাত অতিক্রম করে যাবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের সমপরিমাণ গতিসম্পন্ন হবে। পুলসিরাত ঘন তমসাচ্ছন্ন থাকবে। কেবল ইমানদারদের সামনে তাদের ইমানের নুর ও শিখা থাকবে। সেই নুর তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন :

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ

সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিকা নারীরা মুমিনদের বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করো, যাতে তোমাদের নুর থেকে আমরাও কিছুটা আলো গ্রহণ করতে পারি। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও। এরপর নুর তালাশ করো। তখন তাদের মাঝখানে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর। তার মধ্যে থাকবে একটি দরজা, যার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।[৮১]

সিরাতে মুসতাকিম (সরল পথ) পুলসিরাত অতিক্রম করার রূপক উদাহরণ। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সরল পথে আছে, সে আখিরাতে পুলসিরাত সহজে

[৮১] সুরা হাদিদ : ১৩

অতিক্রম করতে পারবে। দুনিয়ার পথ অতিক্রম করতে গিয়ে যার পা ফসকে যাবে, আখিরাতেও তার পা ফসকে যাবে। পুলসিরাত বাস্তবিকই একটি পথ, যা অনুভব করা যাবে এবং প্রত্যেক হাশরবাসী তাদের চর্মচোখের দ্বারা তা দেখতে পাবে। এটা কোনো কাল্পনিক ও রূপক জিনিস নয়।

জান্নাতের সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ সত্য এবং জাহান্নামের আজাব ও শাস্তিও সত্য। সকল শারীরিক ও আধ্যাত্মিক আনন্দ ও শান্তি জান্নাতবাসীরা ভোগ করবে। আর জাহান্নামবাসীরা সকল শারীরিক ও আত্মিক শাস্তি ভোগ করবে।

জান্নাত এবং জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে

৪৩. জান্নাত এবং জাহান্নাম এখন সৃষ্ট। কোনো আয়াত বা হাদিসে স্পষ্টভাবে এ দুয়ের জায়গা নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং জান্নাত এবং জাহান্নাম সেখানে অবস্থিত, যেখানে আল্লাহ চেয়েছেন। কারণ, আমরা আমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এবং জগৎসমূহকে কখনোই পরিব্যাপ্ত করতে পারি না।

ব্যাখ্যা : জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বর্তমানে তা প্রস্তুত রয়েছে। হিসাব গ্রহণের পর একদলকে জাহান্নামে পাঠানো হবে এবং একদলকে জান্নাতে পাঠানো হবে। মুতাজিলারা বলে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কিয়ামতের দিন সৃষ্টি করা হবে। তাদের এ বক্তব্য ভুল ও পরিত্যাজ্য।

ফাসিক মুমিন জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না

৪৪. কবিরা গোনাহকারী মুসলমানকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী করা হবে না। এ বিষয়টিই আল্লাহ তাআলা কুরআনে এভাবে তুলে ধরেছেন : 'তোমাদেরকে যেই বড় বড় গোনাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা যদি তা পরিহার করে চলো, তবে আমি নিজেই তোমাদের

ছোট ছোট গোনাহ মিটিয়ে দেবো'।[১০] অর্থাৎ, নামাজ এবং কাফফারাসমূহের মাধ্যমে আমি সেগুলোকে মোচন করে দেবো।

ব্যাখ্যা : ফাসিক মুমিনরা তাদের পাপাচারের শাস্তি ভোগ করার জন্য কিছুকাল জাহান্নামে থাকবে। পাপাচারের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করার পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের ইমানের বরকতে তাদের চেহারা কুৎসিত করা হবে না এবং তাদেরকে বেড়ী ও জিঞ্জির পরানো হবে না। জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি একমাত্র কাফিরদের জন্যই নির্দিষ্ট। যাদের অন্তরে অণু পরিমাণ ইমান থাকবে, তারা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে না। তাদের শেষ ফায়সালা আল্লাহর রহমতের দ্বারা হবে এবং তাদের চিরকালের আবাসস্থল হবে জান্নাত।

আল্লাহর কুদরত এবং তাঁর সুন্নাহ

৪৫. আল্লাহ তাআলা কবিরা গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়াও সম্ভব। তবে দুনিয়া এবং আখিরাতে আল্লাহ তাআলার কাজসমূহ দু-ধরনের : (এক) আল্লাহ তাআলার রীতির অনুকূল। (দুই) স্বাভাবিকতার খেলাফ প্রকাশিত। যে কবিরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে, তাকে ক্ষমা করা আল্লাহর পক্ষে সম্ভব। তবে তা স্বাভাবিকতার খেলাফ। এমনিভাবে মানুষের হকসমূহ ক্ষমা করে দেওয়াও আল্লাহর পক্ষে সম্ভব। তবে তা স্বাভাবিকতার খেলাফ। আর এটা হলো বাহ্যদৃষ্টিতে বিরোধপূর্ণ নসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার পন্থা।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ বলেন :

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ
وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

---

[১০] সুরা নিসা : ৩১

তোমরা কুফফার গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই কোরো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান করবেন এবং তিনি মুমিনদের অন্তর প্রশান্ত করবেন।[৯১]

আল্লাহ তাআলা এখানে মুমিনদের লড়াই করার আদেশ দিচ্ছেন। অথচ তিনি চাইলে মুমিনরা লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়াই কুফরি শক্তিকে পরাজিত ও পরাভূত করতে পারেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ওপর লড়াই করাকে ফরজ করেছেন। কারণ, এক হলো আল্লাহর কুদরত (ক্ষমতা)। আরেক হলো আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ (শৃঙ্খলা)। তিনি চাইলে তো সবকিছুই করতে পারেন। কারণ, তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি চাইলে তো সকল পথভ্রষ্টকে সুপথপ্রাপ্তে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সাধারণভাবে এটা করবেন না। এটা আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ পরিপন্থী। কারণ, আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ায় সবকিছুকে কোনো উপকরণের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। তিনি সবাইকে বাধ্য করে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করলে তো এই পৃথিবী আর পরীক্ষাকেন্দ্র থাকবে না। জান্নাত থেকে বের করে পৃথিবীতে মানুষ প্রেরণেরই আর অর্থ থাকবে না। পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। আল্লাহ মানুষকে তা দিয়েছেন। আর তিনি সবার ভাগ্যে পরিবর্তন আনেন।

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

সেই দিনগুলো আমি মানুষের মধ্যে অদলবদল করি।[৯২]

আজ মুসলমানদের হাতে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা নেই। অথচ এককালে তারা নেতৃত্ব দিয়েছে এ পৃথিবীর। বর্তমান দুনিয়ার পরাশক্তি হলো ইউরোপ-আমেরিকা। অথচ অতীতে কখনো নেতৃত্বের বাগডোর তাদের হাতে উঠেছিল বলে আমার জানা নেই। আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সম্প্রদায়ের ভাগ্যে পরিবর্তন আনেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। এটা আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ। কুরআনে এসেছে :

[৯১] সুরা তাওবা : ১৪
[৯২] সুরা আলে ইমরান : ১৪০

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন কোনো জাতির ওপর কোনো বিপদ আনার ইচ্ছা করেন, তখন তা রদ করা সম্ভব নয়। আর তিনি ছাড়া মানুষের কোনো রক্ষাকর্তা থাকতে পারে না।[৯৩]

আল্লাহ তাআলা মুজাহিদ সাহাবিরা বদর প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়াই কাফিরদের পরাজিত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। সাহাবিগণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর সামনে অবনীত হয়ে প্রার্থনা করে বলেছেন :

اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ

‘হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমার জন্য তা বাস্তবায়ন করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা দান করুন। আপনি যদি ইসলামের অনুসারীদের এই দলকে ধ্বংস করে দেন, তাহলে জমিনে আর আপনার ইবাদত হবে না।’[৯৪]

মুসলমানরা যখন শরিয়াহ নির্দেশিত উপায়-উপকরণ গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্য করলেন। আকাশ থেকে ফেরেশতাদের বাহিনীও অবতীর্ণ করলেন। সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ

[৯৩] সুরা রাদ : ১১
[৯৪] *সহিহ মুসলিম*: ১৭৬৩

তোমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং তোমার দ্বারা অন্যদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছি।...

وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ

'কুরাইশকে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

আমি তখন বললাম, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি যদি এ কাজ করি, তাহলে তারা তো আমার মাথা ভেঙে রুটির মতো টুকরো টুকরো করে ফেলবে'! আল্লাহ তাআলা বললেন, 'তারা যেভাবে তোমাকে বহিষ্কার করেছে, তুমিও ঠিক সেভাবে তাদেরকে বহিষ্কার করো। তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। (আমার পথে) ব্যয় করো, তোমার জন্যও ব্যয় করা হবে। তুমি একটি বাহিনী প্রেরণ করো, আমি অনুরূপ পাঁচটি বাহিনী প্রেরণ করবো, যারা তোমার আনুগত্য করে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যারা তোমার বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের সাথে লড়াই করো।'[৯৫]

লেখক রহ. এখানে এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা কবিরা গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়াও সম্ভব। তবে দুনিয়া এবং আখিরাতে আল্লাহ তাআলার কাজসমূহ দু-ধরনের : (এক) আল্লাহ তাআলার রীতির অনুকূল। (দুই) স্বাভাবিকতার খেলাফ প্রকাশিত। যে কবিরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে, তাকে ক্ষমা করা আল্লাহর পক্ষে সম্ভব। তবে তা

[৯৫] *সহিহ মুসলিম* : ২৮৬৫

স্বাভাবিকতার খেলাফ। এমনিভাবে মানুষের হকসমূহ ক্ষমা করে দেওয়াও আল্লাহর পক্ষে সম্ভব। তবে তা স্বাভাবিকতার খেলাফ।

কিয়ামতের দিনের শাফাআত

৪৬. শাফাআত সত্য ওই ব্যক্তির ব্যাপারে, যার ব্যাপারে শাফাআতের অনুমতি রহমান দেবেন। উম্মতের কবিরা গোনাহকারী ব্যক্তিদের জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর শাফাআত সত্য। আর তাঁর শাফাআত কবুল করা হবে। যেসব আয়াত ও হাদিসে শাফাআতকে নাকচ করা হয়েছে, সেখানে উদ্দেশ্য হলো এমন শাফাআত, যা আল্লাহ তাআলার অনুমতি এবং সন্তুষ্টিক্রমে হবে না।

কবরের আজাব

৪৭. কবরে পাপিষ্ঠদের জন্য আজাব হওয়া এবং মুমিনদের জন্য নেয়ামত বর্ষিত হওয়া সত্য। মুনকার এবং নাকিরের জিজ্ঞাসা সত্য। সৃষ্টিজীবের প্রতি রাসুলগণের প্রেরিত হওয়া সত্য। রাসুলগণের ভাষ্যে আল্লাহ কর্তৃক তাঁর বান্দাদের আদেশ-নিষেধ পালনের বাধ্যবাধকতা প্রদান সত্য।

নবিসম্পর্কিত আকিদা

৪৮. নবিগণ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যে স্বকীয় হয়ে থাকেন, যেগুলো সম্মিলিতভাবে তাঁরা ছাড়া অন্যদের মধ্যে পাওয়া যায় না; যেগুলো প্রমাণ করে যে, তাঁরা নবি। তাঁদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো স্বাভাবিক রীতির পরিপন্থী কোনো কিছু প্রকাশিত হওয়া। আরেকটি হলো তাঁদের স্বভাব ত্রুটিমুক্ত হয়ে থাকে। তাঁদের চরিত্র হয়ে থাকে পরিপূর্ণ ইত্যাদি।

৪৯. নবিগণ সুরক্ষিত—কুফর থেকে, ইচ্ছাকৃত কবিরা গোনাহ করা থেকে এবং সগিরা গোনাহের ওপর অবিচল হওয়া থেকে। আল্লাহ তাআলা এসব থেকে তাঁদের তিনভাবে সুরক্ষিত রাখেন :

(ক) আল্লাহ তাআলা তাঁদের সৃষ্টিই করেন ত্রুটিমুক্ত স্বভাব এবং ভারসাম্যপূর্ণ চরিত্র দিয়ে। তাই তারা গোনাহের ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করেন না। বরং তাঁরা সর্বদা গোনাহকে ঘৃণা করে তা থেকে দূরত্ব অবলম্বন করেন।

(খ) আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি এই মর্মে ওহি অবতীর্ণ করেন যে, গোনাহের ওপর শাস্তি প্রদান করা হবে এবং নেক আমলের ওপর প্রতিদান দেওয়া হবে। এরপর এই চেতনা তাঁদের গোনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে।

(গ) আল্লাহ তাআলা তাঁদের মধ্যে এবং গোনাহের মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম অদৃশ্য আবরণ সৃষ্টি করার মাধ্যমে অন্তরায় হয়ে যান। যেমন, ইউসুফ আ.-এর ঘটনায় তাঁর সামনে দাঁত কামড়ে থাকা অবস্থায় ইউসুফ আ.-এর আকৃতি প্রকাশিত হওয়া।

৫০. মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ নবি। তাঁর পর আর কোনো নবির আবির্ভাব ঘটবে না; যেমনিভাবে তিনি বলেছেন : 'আমার মাধ্যমে নবিগণের ধারা সমাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।'নবি ﷺ-এর দাওয়াত জিন এবং মানুষ সকলের জন্য ব্যাপক। তিনি এই বৈশিষ্ট্য এবং এ-জাতীয় আরও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে অন্যান্য নবিগণের চাইতে শ্রেষ্ঠ।

ওলিগণের কারামত

৫১. ওলিগণের কারামত সত্য। আর ওলি হলেন তারা, যারা মুমিন, যারা আল্লাহ তাআলা এবং তার গুণাবলির মারিফাত লাভকারী এবং যারা সুদৃঢ় ইমানের সঙ্গে নেক আমল সম্পন্নকারী। আল্লাহ তাআলা

কারামাতের মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা করেন, সম্মানিত করেন। তিনি যার ব্যাপারে চান, তাকে তার বিশেষ রহমতের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন।

ব্যাখ্যা : ওলিগণের কারামত সত্য বলে মনে করতে হবে। অর্থাৎ ওলিগণের দ্বারা এমন কিছু অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হয়, যা নবিগণের মুজিযার নিদর্শনস্বরূপ এবং তাদের অলৌকিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবিম্ব। আল্লাহর কিতাব, রাসুলের সুন্নাহ ও উম্মাহর ইজমার দ্বারা এটা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি ওলিগণের কারামত অবিশ্বাস করে, সে মৌলিক ও দীনের আবশ্যক জ্ঞান অস্বীকারকারীদের মধ্যে গণ্য। নবি থেকে যে মুজিযা প্রকাশিত হয়, তা ওই নবির নবুওয়াতের দাবির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ওলি থেকে যে কারামত প্রকাশিত হয়, তা ওই নবির অনুসরণের বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। ওলি থেকে যে কারামত প্রকাশিত হয়, তা নবির বরকত ও কামালিয়াতের অনুকরণ ও অনুসরণের জন্যই হয়ে থাকে। সুতরাং মুজিযা ও কারামতের মধ্যে কোনো সংশয় নেই, যেমনটা কারামত অস্বীকারকারীরা মনে করে থাকে। যে ব্যক্তি ইমানদার নয় এবং সৎকর্মও করে না, তার নিকট থেকে যদি কোনো অলৌকিক কিছু প্রকাশিত হয়—যেমন, শয়তান ও দাজ্জাল থেকেও অনেক অলৌকিক কাণ্ড প্রকাশিত হওয়ার প্রমাণ কুরআন-হাদিসে পাওয়া যায়—তাহলে এগুলোকে কারামত হিসেবে বিশ্বাস করা যাবে না। বরং এগুলো হলো ভেলকিবাজি (ইসতিদরাজ) ও প্রতারণা মাত্র। মুমিনদের ইমান পরীক্ষা করার জন্য দুষ্ট কাফিরদের এ ধরনের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং তাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ ও অবমাননাকর হবে।

মুতাজিলারা ওলিগণের কারামত অস্বীকার করে। তারা কেবল দুয়া কবুলের কারামত সমর্থন করে। অথচ ওলিগণের কারামত সরাসরি কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ :

১. মারয়াম আ.—যিনি ওলি ও সিদ্দিকা ছিলেন; নবি ছিলেন না—তাঁর কাছে এক মওসুমের ফল আরেক মওসুমে এবং অভিনব খাদ্যবস্তু প্রেরিত হওয়ার কথা কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে :

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

জাকারিয়া আ. যখনই তার ইবাদতখানায় যেতেন, তখনই তার কাছে কোনো রিজিক দেখতে পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মারয়াম, তোমার কাছে এসব খাদ্যবস্তু কোথা থেকে আসে?' মারয়াম বলল, 'আল্লাহর নিকট থেকে। আল্লাহ যাকে চান, অপরিমিত রিজিক দান করেন।'[৯৬]

২. সুলায়মান আ.-এর মন্ত্রী ও পরামর্শক আসাফ ইবনু বারখিয়া—যিনি নবি ছিলেন না—পলকের মধ্যে রানি বিলকিসের তখত নিয়ে সুলায়মান আ.-এর সামনে উপস্থিত করেন। এ ঘটনা কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে :

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ

যার কাছে ছিল কিতাবের ইলম, সে বলল, আমি আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই তা আপনার সামনে এনে দেবো। অনন্তর সুলায়মান যখন সিংহাসনটি নিজের সামনে রাখা অবস্থায় দেখলেন তখন বলে উঠলেন, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে চান যে, আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করি নাকি অকৃতজ্ঞতা করি।[৯৭]

৩. আসহাবে কাহাফের ঘটনা কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে। ১৫তম পারায় এ নামে পূর্ণ একটি সুরাই রয়েছে। আসহাবে কাহাফের যুবকেরা

[৯৬] সুরা আলে ইমরান : ৩৭
[৯৭] সুরা নামল : ৪০

শত শত বছর পরে একবার পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন। এটা ছিল তাদের কারামত।

এ ছাড়াও সাহাবিগণের অনেক কারামতের ঘটনা বিশুদ্ধ বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে। এখানে প্রসঙ্গত একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কোনো ওলি কখনো কোনো নবির মর্যাদায় উপনীত হতে পারেন না। নবিগণ নিষ্পাপ ছিলেন; কিন্তু ওলিগণ নিষ্পাপ নন। তা ছাড়া নবিগণের অশুভ পরিণামের কোনো আশংকা ও সন্দেহ নেই। ওলিত্ব আংশীকভাবে অর্জিত; পক্ষান্তরে নবুওয়াত আল্লাহর দান। তা ছাড়া নবি কখনো তাঁর পদ থেকে অপসারিত হন না। ওলিগণ পাপাচারে লিপ্ত হতে পারেন। নবির ইলহাম ও স্বপ্ন সত্য ও সঠিক এবং তা উম্মাহর জন্য দলিলস্বরূপ। পক্ষান্তরে ওলির কাশফ ও ইলহাম জন্নি (অনুমাননির্ভর)। ওলির ইলহাম বা কাশফ দলিল নয় এবং তার ওপর কারও আমল করা অপরিহার্য নয়। নবিকে তাঁর নিজের নবুওয়াতের ওপর ইমান আনা জরুরি। ওলি যদি নিজেকে পাপী মনে করেন তবে তার ওলি হওয়ার ওপর কোনো প্রভাব হওয়ার পড়ে না।

জান্নাতের সাক্ষ্য

৫২. আমরা জান্নাত এবং কল্যাণের সাক্ষ্য দিই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবি[৯৮], ফাতিমা, খাদিজা, আয়িশা, হাসান এবং হুসাইন রা.-এর ব্যাপারে। আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি। ইসলামে তাঁদের মহান অবস্থানের কথা স্বীকার করি। একইভাবে আমরা বদর যুদ্ধ ও বাইয়াতে রিজওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের ব্যাপারেও জান্নাত এবং কল্যাণের সাক্ষ্য দিই।

[৯৮] অর্থাৎ সেই দশজন সাহাবি, রাসুলুল্লাহ ﷺ যাদেরকে এক মজলিসে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তারা হলেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, সাঈদ, সাদ, তালহা, যুবায়র, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ এবং আবদুর রহমান ইবনু আওফ রা.।

খিলাফাতে রাশিদাহ

৫৩. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পর আবু বকর রা. প্রকৃত ইমামুল মুসলিমিন। এরপর উমর, এরপর উসমান এবং এরপর আলি রা.। এই চারজনের মাধ্যমেই খিলাফাতে রাশিদাহ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এরপর যারা এসেছেন, তারা ছিলেন বাদশাহ।

ব্যাখ্যা : খিলাফাতে রাশিদাহ এমন একটি শাসনকর্তৃত্বের নাম, যার সকল রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ব্যবস্থাপনা নবুওয়াতের পদ্ধতির ওপর বিন্যস্ত। 'রাশিদাহ' অর্থ হলো, আল্লাহপ্রদত্ত সাহায্য ও তাওফিক ওই খিলাফাতকে সঠিক হিদায়াত ও সত্য পথের দিকে পৌঁছে দেয়। খিলাফাতে রাশিদার রয়েছে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রহ. *ইযালাতুল খাফা* গ্রন্থে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি লেখেন :

'(ক) খিলাফাতে রাশিদাহর অপরিহার্য শর্ত হলো, খলিফাকে উম্মাহর প্রথম স্তরের মধ্য থেকে হতে হবে। অর্থাৎ সিদ্দিক, শহিদ, নেককার এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে 'মুহাদ্দাস' হতে হবে। 'মুহাদ্দাস' হওয়ার অর্থ হলো এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া, যার অন্তরে অদৃশ্যলোক থেকে দিব্যজ্ঞান ইলহাম হয়ে থাকে এবং ফেরেশতারা গোপনে যার সঙ্গে কথোপকথন করে থাকে। সিদ্দিকের মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলি অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর পক্ষ থেকে 'মুহাদ্দাস' হওয়ার গুণ লাভ করেছিলেন উমর রা., যা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

খলিফাকে উম্মাহর প্রথম স্তরের মানুষ হতে হবে। কারণ, বাহ্যিক প্রশাসনের সঙ্গে গোপন ব্যবস্থাপনাও একীভূত থাকে। খিলাফাতে রাশিদার চার খলিফা যে সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ ছিলেন, তা সূর্যালোকের মতো সুস্পষ্ট।

(খ) খলিফার জ্ঞান ও কর্মশক্তি প্রকৃতিগতভাবে ও কৌশলগত দিক থেকে নবি ﷺ-এর জ্ঞান ও কর্মশক্তির মতো হতে হবে। আর তার যোগ্যতা, চরিত্র, অভ্যাস, কর্মতৎপরতা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে নবির সঙ্গে খলিফার বিশেষ সাদৃশ্য থাকতে হবে। যেমন, আয়না সূর্যের প্রতিবিম্বকে আকর্ষণ করে।

অনুরূপ খলিফাদের অন্তরও নবুওয়াত সূর্যের প্রতিবিম্বকে আকর্ষণ করে থাকে।

জ্ঞানের শক্তিতে নবির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার অর্থ এই যে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামপ্রাপ্ত হবেন এবং মহানবি ﷺ-এর নির্দেশকে এমনভাবে উপলব্ধি করবেন, যেন ওসব কিছুই তিনি নিজের চোখে দেখছেন। তার অন্তরের অবস্থা হবে সূর্যের সামনে রেখে দেওয়া আয়নার মতো; যার ফলে সূর্যকিরণ আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়।

কর্মশক্তিতে নবি ﷺ-এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ ইমান, আন্তরিকতা, পরোপকার ও খোদাভীতি তার অন্তরে এমন দৃঢ় ও বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তার দ্বারা সহজাত নিয়মে সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হতে থাকে। কারণ, খুলাফায়ে রাশেদিন জ্ঞান-গরিমার দিক থেকে নবি ﷺ-এর জ্ঞান-গরিমার ছায়া ও প্রতিবিম্বস্বরূপ ছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদিন যদিও ওহিপ্রাপ্ত ছিলেন না, কিন্তু তারা আল্লাহর ইলহামপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তারা অন্তর্দৃষ্টি, কাশফ ও কারামাতের অধিকারী ছিলেন। জ্ঞান ও বিচক্ষণতা, রাষ্ট্রীয় কূটনীতি ও রাজনীতি, ধার্মিকতা ও দরবেশি, দারিদ্র্য ও ইবাদতগোজারি, ইলম ও হিকমাত ইত্যাদি গুণাবলিতে খুলাফায়ে রাশেদিন নবি ﷺ-এর আদর্শের অনুসারী ছিলেন।

সকল মুসলমান খুলাফায়ে রাশেদিনের সাক্ষাৎ-সাহচর্য এবং তাদের খিদমত ও আনুগত্যকে সৌভাগ্যের বিষয় হিসেবে গণ্য করতেন এবং আখিরাতের পুঁজি হিসেবে মনে করতেন।

(গ) খিলাফাতে রাশিদার অপরিহার্য যোগ্যতার মধ্যে এটাও গণ্য যে, ওই খলিফাগণ নবুওয়াতের কাণ্ডারীর দরবার থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন এবং নবি ﷺ তাদেরকে শর্তহীনভাবে জান্নাতি বলে অভিহিত করেছিলেন। এই সুসংবাদের দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা সৎ, খোদাভীরু ও পরহেজগার ছিলেন। কবিরা গোনাহ থেকে তারা পবিত্র ছিলেন এবং তারা মুক্তি ও সৌভাগ্যের দ্বারা শুভ পরিণামের অধিকারী ছিলেন।

খুলাফায়ে রাশেদিনের চার খলিফা সম্পর্কে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

(ঘ) খিলাফাতে রাশিদার অপরিহার্য যোগ্যতার মধ্যে এটাও গণ্য যে, তাদের সঙ্গে নবি ﷺ-এর সম্পর্ক এমন হবে, যেমন কোনো বাদশাহর সঙ্গে তার যুবরাজ ও খাস মন্ত্রী এবং পরামর্শদাতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে।

(ঙ) খিলাফাতে রাশিদার যোগ্যতার আরেকটি অপরিহার্য শর্ত হলো, খুলাফায়ে রাশেদিনের সাহর্যের বরকত নবি ﷺ-এর সাহচর্যের বরকতের নমুনা হবে। তাদের কারামত নবি ﷺ-এর মুজিযার নমুনা এবং তাদের উপদেশ নবি ﷺ-এর উপদেশের নমুনাস্বরূপ হবে। এইসব গুণাবলি খুলাফায়ে রাশেদিনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ছিল।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে নবুওয়াত ও রিসালাত বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিভিন্ন অবয়বে প্রকাশিত হয়েছে। নবুওয়াত ও রিসালাত কখনো বাদশাহির মাধ্যমে, কখনো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে এবং কখনো পরহেজগারি ও খোদাভীতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, দাউদ আ. ও সুলায়মান আ.-এর নবুওয়ার বাদশাহির মাধ্যমে, জাকারিয়া আ. ও ইসা আ.-এর নবুওয়াত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে এবং ইয়াহইয়া আ. ও ইউনুস আ.-এর নবুওয়াত যুহদ ও ইবাদতের মাধ্যমে প্রকাশিত ও বিকশিত হয়।

যে মাধ্যমেই নবুওয়াত প্রকাশিত হোক না কেন, প্রত্যেক পদ্ধতির ক্ষেত্রেই তাদেরকে সম্মান ও বিজয় দান করা হয়েছে এবং উম্মাহকে আনুগত্য করার যোগ্যতা দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের নিয়ামতে ভূষিত করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ যেহেতু রাসুলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ ছিলেন, তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাত উপরিউক্ত সকল পদ্ধতির সম্মিলিত রূপ ছিল। অর্থাৎ তার নবুওয়াতে বাদশাহি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যুহদ ও পরহেজগারি সবকিছুর মিশ্রণ ছিল।

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা ছিল দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো। কিন্তু পর্যায়ক্রমে তার উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। উন্নতির শীর্ষ সোপানে উপনীত হওয়ার মুহূর্তেই মুহাম্মাদ ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। ফলে আল্লাহর সঙ্গে মুহাম্মাদ ﷺ-এর যে ওয়াদা ছিল, তা তাঁর খলিফাদের দ্বারা পূর্ণ হয় এবং খিলাফাতে রাশিদাহ যেহেতু

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াতের সার্বিক প্রতিনিধিত্ব এবং তাঁর সার্বিক অবয়বের প্রতিফলন ছিল, তাই হুজুর ﷺ-এর মতো খুলাফায়ে রাশেদিনও উপরিউক্ত তিন দিক থেকেই সার্বিক যোগ্যতার অধিকারী হন। অর্থাৎ তারা বাদশাহ হন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী, ইবাদতকারী, পরহেজগার, পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শক, কারামত ও বরকতের অধিকারী হন। এককথায়, রাসুলুল্লাহ ﷺ যেমন ওই তিন প্রকার গুণের ধারক ছিলেন, তেমনি তার সত্যিকার প্রতিনিধিগণও ওইসব গুণে বিভূষিত ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ হাদিসে বলে গেছেন :

خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ

নবুওয়াতের খিলাফাত তথা নববি রীতি ও কর্মপন্থার আদলে পরিচালিত খিলাফাতকাল হবে ৩০ বছর। এরপর আল্লাহ যাকে চান, বাদশাহি দান করবেন।[১১]

খিলাফাতে রাশিদাহ এবং অন্যান্য শাসনব্যবস্থার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) খিলাফাতে রাশিদায় খলিফা সর্বোচ্চ তাকওয়ার অধিকারী হন। তিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আজিমত ও আদর্শের ওপর অটল থাকেন। অধিক সতর্কতাবশত অনেক সাধারণ বৈধ কাজও পরিহার করে চলেন। ভোগ-বিলাসিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকেন। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনই হয় তার অভীষ্ট লক্ষ্য। নিজের লাভ-ক্ষতির বিবেচনা ও স্বার্থ লাভের বিন্দুমাত্র কামনা তার অন্তরে জাগ্রত হয় না। তিনি আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে নফসের সামান্যতম মিশ্রণকেও শিরক মনে করেন।

(খ) সাধারণ খিলাফাতও ইনসাফপূর্ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে খলিফা শরিয়তের অনুসারী হন এবং জোর-জুলুম ও যাবতীয় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। তবে তিনি সাধারণ বৈধ বিষয়াদি ও আরাম-আয়েশ গ্রহণেও সচেষ্ট হন। যেমন, মুআবিয়া রা.-এর খিলাফত ও রাজত্ব।

---

[১১] *সুনানু আবি দাউদ*: ৪৬৪৬

(গ) সালতানাতে জাবিরাহ বলা হয় ওই শাসনব্যবস্থাকে, যেখানে শাসকের আরাম-আয়েশ ও বিলাসপ্রিয়তা শরিয়তের সীমা লঙ্ঘন করে এবং জুলুম-স্বৈরাচারের সীমানায় গিয়ে উপনীত হয় এবং এর থেকে তিনি তাওবা না করেন।

(ঘ) সালতানাতে দাল্লাহ বা পথভ্রষ্ট শাসনব্যবস্থা বলা হয় ওই রাজত্বকে, যেখানে শাসকের প্রবৃত্তি এমনই লাগামহীন হয় যে, সারাজীবন তিনি পাপাচার ও ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকেন। দাম্ভিকতা-স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত করে ছাড়েন। জুলুম-অত্যাচারের স্থায়ী বুনিয়াদ গড়ে তোলেন।

(ঙ) সালতানাতে কুফর বলা হয় ওই শাসনব্যবস্থাকে, যেখানে শাসক আল্লাহ তাআলার শরিয়তকে প্রত্যাখ্যান করে মানবরচিত শরিয়তের আলোকে রাষ্ট্রপরিচালনা করে। ইসলামি আইনের মোকাবেলায় অন্য কোনো আইনকে উন্নত বা বাস্তবসম্মত মনে করে। ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে। এভাবে ইলহাদ ও খোদাদ্রোহিতার গোড়াপত্তন করে।

শাইখাইনের মর্যাদা

৫৪. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন আবু বকর রা.। এরপর উমর রা.। আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ বলার দ্বারা সব বিচারের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাচ্ছি না যে, তা বংশ, সাহসিকতা, শক্তি এবং জ্ঞান ইত্যাদিকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার অর্থ হলো, তাঁদের দ্বারা ইসলামের যে সুমহান উপকার হয়েছে, তা অন্যদের দ্বারা হয়নি।

৫৫. প্রকৃতপক্ষে আমির হলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। আর আবু বকর এবং উমর রা. হলেন তাঁর দু-মন্ত্রী। সত্যের প্রচারে তাঁরা পরিপূর্ণ মনোবল ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন।

৫৬. নবি ﷺ-এর মধ্যে দুটো বিষয় ছিল : (এক) তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে গ্রহণ করতেন। (দুই) তিনি মাখলুককে প্রদান করতেন। আর মাখলুকের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করা, তাঁদেরকে দীনের পতাকাতলে একত্রিত করা এবং সুনিপুণভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আবু বকর এবং উমর রা.-এর রয়েছে সবিশেষ অবদান।

সাহাবিদের ব্যাপারে আমাদের করণীয়

৫৭. আমরা সকল সাহাবির ব্যাপারে উত্তম আলোচনা ছাড়া ভিন্ন কোনো মন্তব্য ও সমালোচনা করা থেকে আমাদের মুখকে সংযত রাখি। দীনের ব্যাপারে তাঁরা আমাদের নেতা ও অনুসৃত।

৫৮. সাহাবিদের গালি দেওয়া হারাম এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব।

ব্যাখ্যা : সকল সাহাবি নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন এবং তাদের সকল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য ছিল। তাবেয়িদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উম্মাহর সকল আলিম হাদিসের অন্যান্য বর্ণনার মতো সাহাবিগণের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনো বিতর্কে উপনীত হননি এবং তারা কোনো যাচাই ও সমালোচনা ব্যতিরেকে সাহাবিদের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এটাই তাদের ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ। কুরআন মাজিদও সাহাবিদের প্রশংসায় ভরপুর। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও তাদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

তা ছাড়া সাহাবিগণের ন্যায়নিষ্ঠা এবং তাদের বর্ণনার সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা যদি স্বীকৃত না হতো তাহলে দীন ও শরিয়ত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কারণ, ইসলাম ও শরিয়তের বর্ণনাকারী একমাত্র সাহাবিগণই ছিলেন। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথাও আমরা তাঁদের মাধ্যমেই জানতে পেরেছি।

সকল সাহাবিকে সম্মান করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। সাহাবিগণকে ভালোবাসা প্রকৃতপক্ষে নবি ﷺ-কেই ভালোবাসা। তাদেরকে ভালোবাসার নির্দেশ স্বয়ং নবি ﷺ দিয়ে গেছেন। তাদের প্রতি বৈরিতা পোষণ করতে তিনি বারণ করে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে এ দীনকে শক্তিশালী করেছেন। তাদেরকে তার প্রিয়নবির সান্নিধ্যের জন্য বিশেষভাবে বাছাই করেছেন। এ জন্য শাইখ শিবলি রহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহর

সাহাবিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে প্রকৃতপক্ষে রাসুলের ওপরই ইমান আনয়ন করেনি।'

সাহাবিগণের মধ্যে পারস্পরিক যে মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল, সেসব ব্যাপারে তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা যাবে না। বরং তাদের প্রতি ভালো ধারণা রাখতে হবে। স্থান, রাজ্য ও পদমর্যাদার জন্য তারা লোভী ছিলেন—কখনোই এমনটা মনে করা যাবে না। কারণ, এসব কুপ্রবৃত্তি ও কুঅভ্যাস। সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদ ﷺ-এর সান্নিধ্যের বরকতে তাদের অন্তর ছিল লোভ-লালসা, পরশ্রীকাতরতা, সম্পদ ও স্থানের প্রত্যাশা থেকে পূত-পবিত্র। তবে এসব কিছুর পরও তারা মানুষ ছিলেন; নবি বা ফেরেশতা ছিলেন না। নবি ও ফেরেশতারা ভুল-ত্রুটি থেকে নিরাপদ ও নিষ্পাপ হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবিগণের চিন্তার দ্বন্দ্বমূলক ভুল-ত্রুটি হয়ে যাওয়া তাকওয়ার পরিপন্থী নয়।[১০০]

আহলে কিবলাকে কাফির বলা

৫৯. আমরা কোনো আহলে কিবলাকে কাফির বলি না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করে; যিনি সবকিছুর পরিচালক, সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন, স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করে বা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে অথবা নবিকে অস্বীকার করে কিংবা দীনের সর্বজনবিদিত কোনো বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে।

ব্যাখ্যা : শরিয়তের পরিভাষায় আহলে কিবলা বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি ধর্মের সকল অপরিহার্য করণীয় এবং ইসলামের নির্দিষ্ট কার্যাবলিকে স্বীকার করে। যেসব বিধিবিধান কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদিসের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, তার সবকিছুকেই স্বীকার করে ও মেনে নেয়। কোনো ব্যক্তি যদি কিবলামুখী হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে; কিন্তু বিশ্বকে চিরন্তন মনে করে, দৈহিক পুনরুত্থানকে বিশ্বাস না করে, মদ্যপান ও ব্যভিচারকে হালাল

[১০০] দ্রষ্টব্য—সুরা হিজর : ৪৫-৪৭

মনে করে, সে ব্যক্তি কখনোই আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ বলেন :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ইমান রাখো এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করো? তাহলে বলো, যারা এরূপ করে, তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, পার্থিব জীবনে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনতর আজাবের দিকে? তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন।[১০১]

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ

তারপর এটা কেমন আচরণ যে, যখনই কোনো রাসুল তোমাদের কাছে এমন কোনো বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যা তোমাদের মনের চাহিদাসম্মত নয় তখনই তোমরা দম্ভ দেখিয়েছ? অতএব কতক (নবি)-কে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ এবং কতককে হত্যা করতে থেকেছ। আর এসব লোক বলে, আমাদের অন্তর আচ্ছাদনের ভেতর। কখনো নয়! বরং তাদের কুফরির কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। এ কারণে তারা অল্পই ইমান আনে।[১০২]

[১০১] সুরা বাকারা : ৮৫
[১০২] সুরা বাকারা : ৮৭-৮৮

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۞ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

যারা আল্লাহ ও তার রাসুলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় ও বলে, আমরা কতক (রাসুল)-এর প্রতি তো ইমান রাখি এবং কতককে অস্বীকার করি। আর (এভাবে) তারা (কুফর ও ইমানের মাঝখানে) মাঝামাঝি একটি পথ অবলম্বন করতে চায়। এরূপ লোকেই সত্যিকারের কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।[১০৩]

আল্লামা ইদরিস কান্ধলবি রহ. *আকায়িদুল ইসলাম* গ্রন্থে লেখেন :

'আলিমগণের মধ্যে এমন একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি শতকরা ৯৯ ভাগ কুফরিতে লিপ্ত এবং মাত্র এক ভাগ ইমান পোষণ করে, তাকে কাফির বলা যাবে না। কিন্তু এটা জানা উচিত যে, এর অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি দীনের ৯৯টি কথাকে অস্বীকার করে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং দীনের মাত্র একটি কথাকে স্বীকার করে, তাকে কাফির বলা যাবে না। এটা চরম ভুল। কেননা এ কথার ভিত্তিতে তো ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরও কাফির বলা যাবে না। কারণ, ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা ইসলামের কমপক্ষে ৫০ ভাগ কথাকে মানে। ইসলামের সকল কথা অস্বীকার করে, এমন কোনো কাফির দুনিয়াতে নেই।

আলিমগণের এই বক্তব্যের অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত ও সংশয়পূর্ণ কোনো কথা যদি মুখ থেকে বের করে ফেলে, যে কথার মধ্যে ৯৯ ভাগ কুফরির সম্ভাবনা থাকে এবং এক ভাগ ইমানের সম্ভাবনা থাকে তাহলে এহেন

[১০৩] সুরা নিসা : ১৫০-১৫১

সংশয় ও সন্দেহমূলক কথার ওপর ভিত্তি করে তাকে কাফির বলা যাবে না। কিন্তু তাদের কথার এ অর্থ নয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি শরিয়তের তিন শ হুকুম মানে, কেবল তিনটি কথা মানে না—যেমন, ব্যভিচার করা, মদ্যপান করা ও ঘুষ খাওয়াকে হালাল মনে করে—তবে কি সে কাফির হবে না? সে তো কেবল একটি হুকুমই অমান্য করেছে আর বাকি ৯৯টি হুকুমই তো মান্য করেছে। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের ১০০টি আইনের মধ্যে ৯৯টিই মানে, কেবল একটি আইন মানে না, সে ব্যক্তি প্রশাসনের নিকট বিদ্রোহী বলে বিবেচিত এবং ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তার জন্য অবধারিত। অথচ সে ৯৯টি আইন মান্য করে কেবল একটি আইনের বিরোধিতা করার কারণে তাকে এই শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে।'[১০৪]

দীনের সর্বজনবিদিত বিষয় দ্বারা ওই সকল বিষয় উদ্দেশ্য, যা মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত ও প্রমাণিত এবং সাধারণভাবে মুসলমানরা ওইসব বিষয় সম্পর্কে অবহিত। অর্থাৎ ওই বিষয়ের জ্ঞান কেবল নবিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের আওতাভুক্ত। যে সকল বিষয় দীনের সর্বজনবিদিত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যে-কেউ তার কোনোটিকে অমান্য ও অস্বীকার করলে কিংবা তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করলে সে আর মুসলমান থাকবে না; কাফির হয়ে যাবে। ইমান ও ইসলামের জন্য দীনের সকল অপরিহার্য বিষয় মেনে চলা একান্ত আবশ্যক।

যে ব্যক্তি সরকারের সকল আইন-কানুন মেনে চলে, সে-ই সরকারের বিশ্বস্ত। যদি কোনো ব্যক্তি সরকারের ৯৯টি নির্দেশ মেনে চলে; কিন্তু একটি নির্দেশের বেলায় বলে যে, এই নির্দেশ আমার নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এবং এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংশয় ও সন্দেহ পোষণ করে এমন সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু করে দেয়, যা সরকার ও শাসকগোষ্ঠীর ন্যায়বিচারের ধারেকাছেও আসে না তাহলে এমন ব্যক্তিকে সরকারের অনুগত না বলে বিদ্রোহী বলাই সংগত।

দীনি অপরিহার্যতাকে এবং নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত ইসলামি অনুশাসনসমূহের কোনো একটিকে অস্বীকার করা যেমন কুফর, তেমনি ওইসব বিষয়ে বিতর্ক

[১০৪] একই ধরনের কথা হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহ.-ও একাধিক জায়গায় লিখেছেন।

লিপ্ত হওয়াও কুফর। কারণ, নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত বিষয়সমূহে বিতর্ক করা ও সংশয় প্রকাশ করা অস্বীকৃতির নামান্তর।

নামাজ ও রোজা ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করা যেমন কুফর, তেমনি নামাজ রোজা ও জাকাতের নির্দেশ সম্পর্কে কোনো বিতর্কে লিপ্ত হওয়াও কুফর। যে ক্ষেত্রে কোনো সংশয় দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রেই কেবল বিতর্ক ও পর্যালোচনা প্রযোজ্য হয়। যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত ও দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট, সেসব বিষয়ে বিতর্ক শুধু অস্বীকার করাই নয়; বরং ঠাট্টা ও উপহাস করার নামান্তর।'

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ

৬০. সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো, এর মাধ্যমে যেন কোনো ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে এবং গ্রহণ করার প্রত্যাশা থাকে।

উপসংহার

এই হলো আমার আকিদা। আমি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করি প্রকাশ্যে এবং গোপনে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি অনাদি, যিনি অনন্ত; যিনি প্রকাশ্য, যিনি গুপ্ত।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর অস্তিত্ব দৃশ্যমান নয়, তাঁর অস্তিত্ব গোপন। অর্থাৎ তিনি গুপ্ত। কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব গুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টির অণু-পরমাণু পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্বের ও কুদরতের নিদর্শন বহন করে চলেছে। এ হিসেবে তিনি প্রকাশ্য।

হে আল্লাহ, কিয়ামাতের দিন আপনি আমাকে সেসব মানুষের দলে অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঙ্গে ইমান এনেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দার প্রতি, তাঁর পরিজনের প্রতি, তাঁর সাহাবিগণের প্রতি এবং তাঁর সকল অনুসারীর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আর তিনি দয়ালুদের মধ্যে সবচে বড় দয়ালু।

আকিদা এমন এক নিয়ন্ত্রক, যা মানুষের কাজকর্ম, আচার-আচরণ থেকে শুরু করে সার্বিক ব্যবহারবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। তার চালচলনের রীতিনীতিকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। তাই আকিদার সামান্যতম অংশেও যদি বিচ্যুতি ঘটে তাহলে তা মানুষের পরিব্যাপ্ত জীবনে এক ভয়ংকর বিশৃংখলার জন্ম দেবে এবং সরল পথের মাঝে অঘোচানো এক দূরত্ব সৃষ্টি করবে। আমরা নিজেদের চলার পথে যত বিকৃতি আর বক্রতার শিকার হচ্ছি, সবকিছুর মূল কারণ হলো, আমরা কাল্পনিক চিন্তাবিশ্বাস ও অবাস্তব আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েছি। তাই নতুন করে মানবসভ্যতার আকিদা সংশোধন ও মানসিকতা বিশুদ্ধকরণের প্রতি দায়িত্ববান হওয়া একান্ত আবশ্যক। নবোদ্যমে কাল্পনিক বিশ্বাস, অবাস্তব মতাদর্শের সংস্কার ও পরিমার্জনের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য।

সত্য কথা হলো সুমহান এই দীনের বুঝ ও হাকিকত বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজানাই রয়ে গেছে। তাদের বিরাট অংশই বক্রতা ও প্রান্তিকতার শিকার হয়েছে। তাই মহান ইমাম ও যুগসংস্কারক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রহ. প্রণীত এবং সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল অনুবাদক আলী হাসান উসামা অনূদিত বিশুদ্ধ আকিদার গ্রন্থ আল-আকিদাতুল হাসানাহ'র পাঠ-সরোবরে প্রশান্ত অবগাহন করায় সত্যসন্ধানী পাঠকের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম। আসুন, দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আমরা ঝালিয়ে নিই দীর্ঘদিনের জংধরা বিশ্বাস। শুদ্ধ করে নিই প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গলদ মানসিকতা।

-প্রত্যয়